ইসলাম
আমার
ভালোবাসা
আবদুল্লাহ আড়িয়ার

সূচীপত্র

প্রকাশকের আরয

দক্ষিণ ভারতের তামিলভাষার 'দৈনিক নিরোত্তম'-এর প্রখ্যাত সম্পাদক, প্রথম কাতারের প্রবীণ রাজনীতিবিদ, চিন্তাবিদ, পণ্ডিত, লেখক ও ধার্মিক 'নিরূপম আড়িয়ার' একটি নাম, একটি ইতিহাস। তিনি বিভিন্ন ধর্ম ও মতবাদের তুলনামূলক গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। অবশেষে ইসলামের স্বরূপ সন্ধানে অবতীর্ণ হন। ব্যাপক অধ্যয়ন ও চর্চার ফলশ্রুতিতে এ সমাধানে পৌঁছে যান যে, দুনিয়ার শান্তি এবং আখিরাতের মুক্তি একমাত্র ইসলামেই নিহিত। সাথে সাথে ইসলামের সুমহান আদর্শে ঈমান আনেন এবং পিতৃ-ধর্ম-ত্যাগ করে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নেন। ফলে 'নিরূপম আড়িয়ার' হয়ে যান আবদুল্লাহ্ আড়িয়ার।

ইসলামে যে সত্য ও সুন্দরের সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন, যে সত্য ও সুন্দরের ভালোবাসায় মোহিত হয়ে আপন পিতৃপুরুষের ধর্মত্যাগ করেছিলেন, সেই সত্য ও সুন্দরের ভালোবাসার প্রতিচ্ছবি ও বিকশিত রূপই হলো তাঁর লেখা "ইসলাম আমার ভালোবাসা।" বইটি তামিল থেকে উর্দুর মধ্য দিয়ে বাংলায় রূপান্তরিত হয়।

বাংলাভাষী জ্ঞানী-গুণী, সুধী-শিক্ষিত জনদের হাতে বিরাট আশা নিয়ে বইটি তুলে দিচ্ছি। এটি অসত্য ও অসুন্দরের মূলে আঘাত, সত্য ও সুন্দরের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করতে, প্রচ্ছন্ন সত্যের উন্মেষ ও বিকাশ ঘটাতে এবং দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাতে পারলে শ্রম সার্থক মনে করবো।

বইটি অনেক আগেই অনূদিত হয়েছে। কিন্তু আর্থিক অনটনের কারণে প্রকাশে বিলম্ব ঘটেছে। প্রখ্যাত সাংবাদিক অনুজতুল্য জনাব ইসমাঈল হোসেন দিনাজীর লেখা-লেখা ও অক্লান্ত পরিশ্রম প্রকাশনার পেছনে রয়েছে। এর বিনিময় আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁকে দেবেন। বিলম্বে হলেও বইটি পাঠকসমাজের হাতে তুলে দিতে পেরে রাব্বুল আলামীনের শুকরিয়া আদায় করছি।

বইয়ে ভুলত্রুটি হওয়া স্বাভাবিক। কারো নযরে আসলে জানালে বাধিত হবো। যাদের আর্থিক আনুকূল্যে বইটির প্রকাশ সম্ভব হলো, এ যমীনে ইসলামের ভিত্তিভূমি রচনায় আল্লাহ্ তাদের সহায় হোন! আ'মীন!

— মোঃ রুহুল আমীন
চেয়ারম্যান
ইসলাম প্রচার সমিতি

তাং ২৮/১০/৯১

প্রসঙ্গকথা

বিগত ১৯৮৭ ঈসায়ী সালের মাঝামাঝি কোলতাকায় অবস্থানকালে সেখানকার 'দামাল' নামক কাগজে সর্বপ্রথম নিরুপম আড়িয়ারের ইসলাম কবুলের খবরটি পাই। তখন থেকেই প্রবল ইচ্ছে ভদ্রলোকের সাথে সাক্ষাৎ করার। কিন্তু সময় ও সুযোগের অভাবে মাদ্রাজ যাওয়া হয়ে ওঠেনি। ফলে স্বনামধন্য এই নওমুসলিমের সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্যও আমার হয়নি। তবে তাঁর লেখনির সাথে পরিচিত হয়ে একটা আত্মিক সান্নিধ্য আমার গড়ে ওঠে। বিশেষত দিল্লীর ভাই নসীম গাজী ফালাহী কর্তৃক অনূদিত তাঁর হিন্দী সংস্করণ 'ইসলামঃ জিস্‌সে মুঝে পেয়ার হ্যায়' পড়ে এই আত্মিক সম্পর্ক আরো নিবিড় হয়। সত্যি বলতে কি, বইটি যতবার পড়েছি ততবারই যেন আমার বুকের ভেতরটা আলোকিত হয়ে উঠেছে। ইচ্ছে ছিল বইটি আমি নিজেই বাংলায় অনুবাদ করবো। এরই মধ্যে একদিন মুহ্‌তারম বদরে আলম সাহেব ইসলামী আন্দোলনের বিশিষ্ট কর্মী এবং শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আল-কাফি সাহেব কর্তৃক অনূদিত বইটির বাংলা পাণ্ডুলিপি আমাকে সম্পাদনার জন্যে দিলেন। আমার শত অযোগ্যতা সত্ত্বেও সম্পাদনার ন্যায় বিপজ্জনক কাজটি সম্পন্ন করতে পেরে মহান আল্লাহ্‌র দরবারে কৃতজ্ঞতা জানাই।

শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও মুহ্‌তারম কাফি সাহেব কষ্ট স্বীকার করে ক্ষুদ্র কলেবরের অথচ মূল্যবান এই বইখানা আন্তরিকতার সাথে অনুবাদ করে আমাদের সকলকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন বলে আমি মনে করি। এজন্যে তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে খাটো করার ইচ্ছে আমার নেই। অন্য দিকে কম্পিউটার হোম এন্ড প্রিন্টার্স এর সত্ত্বাধিকারী প্রিয় নিয়াজ মাখদুম এবং কম্পিউটার অপারেটর স্নেহের আলম মোরশেদকেও মুবারকবাদ জানাই তাদের সহৃদয় সহযোগিতার জন্যে।

সর্বোপরি আমাদের সকলের এ ক্ষুদ্র প্রয়াস মহান আল্লাহ্‌র পাক দরবারে গৃহীত হোক। আমাদের সকলের ত্রুটি-বিচ্যুতি আল্লাহ মাফ করুন! আ'মীন!

ঢাকা

১৫, ১১, ৯১ ইং

—ইসমাঈল হোসেন দিনাজী

অনুবাদকের কথা

জনাব আব্দুল্লাহ আড়িয়ার একজন সচেতন নওমুসলিম। তিনি ইসলামের প্রতি কিভাবে আকৃষ্ট হলেন 'ইসলাম : জিসসে মুঝে ইশক্ হ্যায়' এই বইটি পড়লে তা বুঝা যায়। রসূল (সাঃ)-এর জীবনচরিত তাঁকে ইসলামের দিকে চুম্বকের মত আকর্ষণ করে। রসূল (সাঃ)-এর জীবনচরিতে যেখানে যে সূক্ষ্ম অনুভূতি লেখককে নাড়া দেয় সেগুলো তিনি নিখুঁতভাবে বইটির বিভিন্ন নিবন্ধে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

লেখক যেভাবে আলোচনা প্রাণবন্ত করেছেন, অনুবাদে হয়তো ততখানি হয়নি তবুও বইটি পড়লে যে কোনো মানুষ এতে দিক-দর্শন পাবেন বলে আমার বিশ্বাস।

অনুবাদের সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরিয়ে দিলে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা যেতে পারে।

পরিশেষে বিশিষ্ট সমাজকর্মী, ইসলামী চিন্তাবিদ ও ইসলাম প্রচার সমিতির সাবেক চেয়ারম্যান বদরে আলম সাহেবের কথা আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। কারণ তাঁর বিশেষ উৎসাহেই আমি এই গুরুত্বপূর্ণ বইটির অনুবাদের মতো দুঃসাহসিক কাজে হাত দিতে অনুপ্রাণিত হই। উল্লেখ্য, তামিলভাষায় লিখিত মূল বইয়ের উর্দু অনুবাদ থেকেই এটি অনূদিত। বইটি পড়ে পাঠকদের সামান্য উপকারে আসলেই মনে করবো আমাদের সকলের শ্রম সার্থক হয়েছে।

— মোঃ আব্দুল্লাহ আল-কাফি
অধ্যাপক,
বীরগঞ্জ কলেজ, দিনাজপুর

লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

আড়িয়ার ১৯৩৫ সালে তামিলনাড়ুর কোইম্বতুর জেলার তিরপুর শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ইন্টারমেডিয়েট পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন। স্কুল ও কলেজ জীবনে সাহিত্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলোতে তার যথেষ্ট আকর্ষণ ছিল। তিনি কলেজে তামিলসাহিত্য শাখার সম্পাদকও ছিলেন। বিনোবা ভাবের ভূদান আন্দোলনে তিনি সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। এই আন্দোলনের মুখপত্র 'গ্রামদান'-এরও তিনি সম্পাদক ছিলেন।

তিনি তামিলনাড়ুর প্রসিদ্ধ দৈনিক তনরল এবং মুরসৌলী পত্রিকার কলামিষ্ট ও সহকারী সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। জনাব আড়িয়ার অনেক নাটকও লিখেছেন। এক সময় তিনি ফিল্মের জন্য কথিকা লিখতেন। তাঁর নাটক ও কথিকাগুলো সমাজে যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছে। লেখক তামিলভাষার একজন অগ্নিঝরা বাগ্মী। উপস্থাপনা পদ্ধতিতে তাঁর একক বৈশিষ্ট্য ছিল।

মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর শাসনামলে জরুরী অবস্থায় গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে তিনিও একজন ছিলেন। এই সময় তাঁকে অনেক বিপদ-আপদের মুখোমুখি হতে হয়েছিল।

এই সময় তিনি দৈনিক নিরোত্তম পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন এবং AJADMK (তামিলনাড়ুর সরকারী দল) এর কর্মপরিষদ সদস্য ছিলেন।

ছোট কাল থেকেই মুসলিম ছাত্ররা তাঁর সাথী ছিল। তাঁর শিক্ষকদের মধ্যেও কয়েকজন মুসলমান ছিলেন। শিক্ষাজীবন এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে বিশিষ্ট মুসলিম ব্যক্তিরা তাঁর বন্ধু ও সাথী ছিলেন। ইসলাম এবং এর নীতিমালা সম্পর্কে সহজভাবে কিছু জানার এই ছিল তাঁর কারণ। অতঃপর তিনি নিজেই ইসলাম সম্পর্কে পড়াশোনার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। এক পর্যায়ে ইসলাম সম্পর্কে গভীরভাবে অধ্যয়নও করেন।

জরুরী অবস্থায় মিথ্যা অভিযোগে তাঁকে গ্রেফতার করা হলে তিনি দেড় বছর নযরবন্দী থাকেন। এ সময় তিনি ইসলাম সম্পর্কে অধ্যয়নের এক সুবর্ণ সুযোগ লাভ করেন। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে তিনি ইসলাম সম্পর্কে গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন।

জেল থেকে মুক্তির পর তিনি নিজের পত্রিকায় এই গ্রন্থের লেখাগুলো ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেন। অদূর ভবিষ্যতে সারা দুনিয়া ইসলামের ছায়াতলে সমবেত হবে বলে লেখক নিরূপম আড়িয়ার দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন।

আল্লাহর মেহেরবানীতে লেখক নিজেও ইসলাম গ্রহণের গৌরব অর্জন করেছেন। তাঁর বর্তমান নাম আব্দুল্লাহ আড়িয়ার।

— এম, এ, জলিল আহমদ

জেনারেল সেক্রেটারী, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, মাদ্রাজ, ভারত

একটি অনুপম আদর্শ

দীন ইসলামকে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তির সংগে দেখে থাকি। এ উদ্দেশেই আমি আমার ধ্যান-ধারণা এখানে লিপিবদ্ধ করছি। আশা করি, সুধী পাঠকবৃন্দ গভীর মনোযোগের সাথে এ পুস্তকখানা অধ্যয়ন করবেন।

সাধারণত ধর্ম প্রতিষ্ঠাতাদের আজকাল প্রাচীনপন্থী বলা হয়। অথচ আমার পর্যালোচনা এই যে, এঁরা সবাই নিজ নিজ যুগে জাহেলী প্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার এবং সবাই বিপ্লবী নেতা।

হিন্দুধর্ম বা বৈদিক ধর্মের সংস্কারক শংকরাচার্য একজন বিপ্লবী নেতা। বেদের এক অর্থ হচ্ছে, দৃষ্টির আড়াল বা গোপন করা। এ ধরণের ধারণা পোষণকারী দুনিয়াতে 'বেদ সবার জন্য' এর শ্লোগানদাতা রামানুজও একজন বিপ্লবী ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

হযরত মসিহ'র ন্যায় ব্যক্তিত্বও তাঁর যুগে জাহেলী প্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। এমনি করে যদি আমরা ধর্মীয় ইতিহাস অধ্যয়ন করতে থাকি তাহলে আমরা এ সমস্ত ব্যক্তিত্বকে প্রাচীনপন্থী তো নয়ই বরং বিপ্লবী কর্মধারার বিশাল ব্যক্তিত্ব হিসেবে দেখতে পাবো।

আমি আমার অন্তর থেকে এ কথা বলতে মোটেই দ্বিধা করি না যে, এ সমস্ত বিপ্লবী পুরুষের মধ্যে মুহাম্মদ (সাঃ) ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। মুহাম্মদ (সাঃ) ছাড়া অন্য সকলেই কারো না কারো সাহায্যে শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করেছেন; পিতামাতার অথবা নিজ খান্দানও ছিল তাদের প্রশিক্ষণ-কেন্দ্র। অথচ নবী করিম (সাঃ)-এর বেলায় আমরা দেখতে পাই সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁর জন্মের আগেই তাঁর সম্মানিত পিতা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। পিতার চেহারা যারা দেখেনি, তারা রসূল (সাঃ)-এর এই বঞ্চনা ও যন্ত্রণার কথা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারবে।

এ বঞ্চনা এখনও শেষ হয়নি। প্রিয় নবী মাত্র ছ'বছরের শিশু। তাঁর স্নেহময় জননীর সুশীতল ক্রোড় থেকে বঞ্চিত হয়ে তিনি তাঁর মা এবং উম্মে

আইমানের সংগে মদীনায় যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে যেখানে তাঁর পিতার কবর ছিল সেখানে মাতাও ইন্তিকাল করলেন।

শিশু মুহাম্মদ (সাঃ) পিতার চেহারা দেখেননি। অতি অল্প বয়সে মা হারানোর দুঃখ সইতে হলো। এতিম এই শিশুর আশ্রয়ের অবলম্বন হিসেবে এগিয়ে এলেন দাদা আব্দুল মুত্তালিব। কিন্তু মাত্র দুটি বছর যেতে না যেতেই তিনিও এ দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন।

পিতা, অতঃপর মাতা, তারপর দাদার পরম স্নেহ থেকে বঞ্চিত হলেন তিনি। আর এই সকল বঞ্চনা মাত্র আটটি বছরের মধ্যেই! প্রিয় নবী এখন একা!

বিশ্বমানবতাকে আল্লাহ্‌র রহমতের কিনারায় আনয়নকারী নবীকে দেখা গেল আশ্রয়হীন অবস্থায় একাকী দাঁড়িয়ে। এই শোচনীয় অবস্থায় তাঁর চাচা আবু তালিব পাশে এসে দাঁড়ালেন। পিতামাতা থেকে বঞ্চিত ব্যক্তির কষ্ট ও বঞ্চনা একমাত্র সেই বুঝতে পারে যে পিতামাতাকে হারিয়েছে।

এমনি করে বঞ্চনায় লালিত এক এতিমের হাতেই ইসলামরূপী বিশাল সম্পদ দুনিয়া পেলো। এই এতিমের দাওয়াত স্পেন থেকে চীন তথা দুনিয়ার একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত প্রসারিত হলো। এ এক বিষ্ময়কর ব্যাপার এবং সত্যের অমোঘ বাস্তবতা। প্রিয় নবীর নিষ্পাপ ও আবিলতামুক্ত জীবনই ইসলামের প্রচার ও প্রসারের একমাত্র কারণ। যথার্থভাবেই এখন একথা বলা যেতে পারে যে, মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পবিত্র সত্তা বিশ্বমানবতার এক অনুপম নমুনা।

পশুচারণকারী শাহানশাহ

নবী করিম (সাঃ)-এর জীবন ছোটকাল থেকে নিয়ে শেষকাল পর্যন্ত একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এমন অনেক বড় নেতা এবং ধর্মীয় পথ প্রদর্শক আছেন, যাদের প্রাথমিক জীবন ভ্রান্তমত ও পথে অতিবাহিত। কিন্তু বুদ্ধি হওয়ার সময় থেকে নিয়ে শেষজীবন পর্যন্ত নবীজীবন ছিল পাক ও পবিত্র; গোটা জীবনে কোথাও না ছিল কোনো ত্রুটি, না ছিল কোনো ধোকাবাজি।

তিনি তাঁর চাচা আবু তালিবের তত্ত্বাবধানে ছিলেন। আবু তালিবের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো ছিলনা। এজন্য আর্থিক বোঝা কমানোর জন্য নবী (সাঃ) মজুরীর বিনিময়ে পশুচারণের কাজে নিয়োজিত ছিলেন।

* আমার হুজুর!
* সারা দুনিয়াকে সোজা রাস্তা দেখানো জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রেরিত নেতা।
* আরবদেরকে জ্ঞান বিজ্ঞানের সম্পদে সমৃদ্ধকারী।
* রোম সাম্রাজ্যের বিশাল শক্তিকে পরাভূতকারী বীর।
* প্রযুক্তি, কর্মদক্ষতা এবং দুনিয়ার সকল সম্পদ ইসলাম অনুসারীদের নিকট প্রত্যাপনকারী এক অতুলনীয় নেতা!
* বাদশাহর বাদশাহ!

অল্প বয়সেই তিনি মজুরীর বিনিময়ে পশুচারণ করেছেন। কত বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্টের যে তিনি শিকার হয়েছেন তা একটু চিন্তা করলে আমাদের গণ্ডদেশ অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে।

এই বিশাল উন্নত চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তির নেতৃত্ব মুসলমানেরা পেয়েছে তাই স্বভাবতই তারা সৌভাগ্যবান।

তিনি বকরী চরিয়েছেন। আপন চাচার সাথে বার বছর বয়সে ব্যবসা উপলক্ষে দেশ থেকে দূরে সফরেও গেছেন। নিজ খান্দানভুক্ত মানুষের মালের সাথে সাথে দুর্বল ও অসহায় নারীদের মালও নিয়ে যেতেন যাতে করে তারাও কিছু কিছু লাভবান হতে পারে। তিনি অসহায় দুর্বলদের কথা সবসময় স্মরণ রাখতেন। আমি বাজার যাচ্ছি, আপনার কি কোনো জিনিসের প্রয়োজন আছে যা আমি নিয়ে আসবো? এই আবেদন প্রতিবেশী, নিকটাত্মীয় ও অসহায়দের মাঝে নিজে এগিয়ে গিয়ে করতেন। তারা যে যে জিনিস চাইতো তা এনে দিতেন।

এইভাবে অসহায় ও উৎপীড়িতের সাহায্যের জন্য 'হিলফুল ফুজুল' নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে তিনিও সেখানে অংশ নেন এবং যথার্থ সহযোগিতা করেন।

তাঁর জীবন সত্যের মূর্তপ্রতীক। তিনি কখনও ওয়াদা খেলাফ করেননি। একবারের একটি ঘটনাঃ এক ব্যক্তি এই বলে চলে গেল যে, "আপনি এখানেই থাকবেন আমি এখনই আসছি"। নবী করিম (সাঃ) সেই জায়গাই দাঁড়িয়ে থাকলেন। একদিন নয়, দুদিন নয়—তিন তিন দিন সেখানেই তিনি দাঁড়িয়ে।

যে ব্যক্তি চলে গেল সে একথা বেমালুম ভুলে গেল যে, সে নবী করিম (সাঃ)-কে সেখানে আটকিয়ে রেখে এসেছে। তৃতীয় দিনে ঘটনাক্রমে সে ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছে। তখন নবী (সাঃ)-কে সেখানে দেখতে পেয়ে লজ্জিত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলো ঃ "কি আপনি এখনও এখানে দাঁড়িয়ে আছেন?" রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এতটুকু রাগ না হয়ে অত্যন্ত নরম সুরে বললেন "আপনিইতো আমাকে এখানে থাকতে বলে গেলেন।'

এমনি ধরনের সুউচ্চ গুণাবলীর কারণেই জনগণ তাঁকে 'আমীন' এবং 'সাদিক' উপাধীতে ভূষিত করেছেন। এই উন্নত মানুষটিকে হযরত খাদীজা (রাঃ) আপন জীবনসংগী হিসেবে বেছে নিলেন। বাস্তবিক পক্ষে এটা হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর বিরাট সৌভাগ্য। এর আগে হযরত খাদীজা (রাঃ) দু'বার বৈধব্যের যাতনা ভোগ করেছেন। তিনি নবী করিম (সাঃ) থেকে পনের বছরের বড় ছিলেন। তাঁর উপাধি ছিল 'তাহিরা'। হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর গর্ভে কাসেম, আবদুল্লাহ, জয়নব, রোকেয়া, উম্মে কুলসুম, ফাতিমা প্রমুখ সন্তানাদি তাঁর ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন। কাসেম ও আব্দুল্লাহ অল্প বয়সেই ইন্তিকাল করেন।

হযরত খাদীজার (রাঃ)-এর সাথে বিয়ের পর নবী করিম (সাঃ)-এর কিছু আর্থিক সচ্ছলতা আসলে রহমতের নবী তা দিয়ে বিধ্বস্ত মানবতার সংস্কারে লেগে যান। পারিবারিক দায়িত্ব পালন করার সাথে সাথে দীনের দাওয়াত ও তার প্রতিষ্ঠায় দায়িত্ব পালন আমরা একমাত্র মহানবীর জীবনেই দেখতে পাই। অন্য দিকে আমরা দেখতেই পাইঃ

* গৌতম বুদ্ধ গ্রহণ করলেন সন্যাস জীবন,
* শংকরাচার্য বিয়ে করলেন না এবং

* হযরত মসিহ থাকলেন অবিবাহিত।

অনেক ধর্মীয় গুরুকে ব্রহ্মচারী, অবিবাহিত এবং সন্যাসী হিসেবে দেখা যায়; কিন্তু নবী করিম (সাঃ)-কে পারিবারিক দায়িত্ব পালনেও দেখতে পাই, আবার ইক্বামতে দীনের সকল দায়-দায়িত্বও তাঁর নিজের কাঁধে নিতে দেখেছি।

শুধু একজন বিবি নয়, কয়েকজন বিবির দায়িত্ব ছিল তাঁর মাথায়। এত সমস্ত বোঝা সত্ত্বেও তাঁর দাম্পত্য জীবন ছিল একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত এবং সামাজিক জীবন ছিল একটি নিখুঁত আদর্শ।

জনগণ তাঁকে আল-আমীন, আস-সাদিক বলতো, কিন্তু যেই মাত্র তিনি দীনের দাওয়াত দিতে শুরু করলেন সেই জনগণই তাঁর চরম বিরোধী হয়ে গেল। ধর্মীয় ইতিহাসে কত জনই তো বিপ্লবী দাওয়াত দিয়েছেন, কিন্তু কারো এত শক্ত বিরোধিতা করা হয়নি যেমনটি করা হয়েছে তাঁর বেলায়। এত কঠিন বিরোধিতার কারণ কি? তাঁর দাওয়াতে আসলে ছিলটা কি?

নিরাকার ইবাদত

দুনিয়ার কোনো বিপ্লবী নেতাই যে-কথা বলেননি, নবী করিম (সাঃ) সে কথা বলেছেন। ইবাদতে আকার, ছবি ও মূর্তি থাকতে পারে না। আর এ শিক্ষা রসূল (সাঃ) চৌদ্দশত বছর আগেই দিয়েছেন। মূর্তি ও ছবি থাকতে পারে না এ কথা বলা অতি সহজ কিন্তু এর চেয়ে এক কদম অগ্রসর হয়ে তিনি মূর্তি ভেঙ্গে দিয়েছেন। তিনি শুধু শিক্ষার কথাই বলেননি, কাজেও পরিণত করে দেখিয়েছেন।

তামিলনাড়ুতে আমরা ই, ভি, আর (EVR)-কে এক বিরাট বিপ্লবী পুরুষ মনে করি, কারণ তিনি শুধু মূর্তিপূজার বিরোধিতা করেছেন তাই নয়, বরং কার্যত তিনি মূর্তি ভেঙ্গেছেনও; কিন্তু নবী করিম (সাঃ) কত শতাব্দী আগে এ কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন সে কথা কুরআনের ভাষায় "জায়াল হাক্কু ওয়া জাহাকাল বাতিল, ইন্নাল বাতিলা কানা জাহুকা"। "সত্য সমাগত, মিথ্যা অপসারিত, নিশ্চয়ই মিথ্যা অপসারিত হওয়ার জন্যই" এই তেলাওয়াত করতে করতে খানায়ে কাবাতে রক্ষিত মূর্তিগুলো একটার পর একটা বিদূরিত

করলেন।

মুসলমানদের সবচেয়ে বড় ঈদ হলো ঈদুল আযহা। এই ঈদ কার স্মরণে পালন করা হয়? তিনি কি করেছেন? হযরত ইব্রাহিম (আঃ) তাঁর নেকবখ্ত সন্তান হযরত ইসমাঈল (আঃ)-কে আল্লাহ্র রাস্তায় কুরবানী করার জন্য অগ্রসর হয়েছিলেন — তাঁর স্মরণে এই ঈদ পালন করা হয়।

হ্যাঁ, এই জাতীয় বুজুর্গ ব্যক্তিদেরও মূর্তি কাবাঘরে রাখা হয়েছিল।

ঈদ পালনের হুকুম তো হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) দিয়েছিলেন। আর এভাবে এই বুজুর্গ ব্যক্তিদের সম্মান ও মর্যাদা কিয়ামত পর্যন্ত জীবন্ত করে রাখলেন। কিন্তু মূর্তিগুলোর অপসারণের সাথে সাথে তিনি তাঁদের ছবিগুলোও কাবা ঘর থেকে দূর করে ফেললেন।

কি? এর চেয়ে বেশী অধিকতর বিপ্লবী পদক্ষেপ চিন্তা করা যায়? এ ভয়ংকর পদক্ষেপ কোন্ দেশে নেয়া হলো? যে দেশের মানুষের শিরায় শিরায় মূর্তিপূজা ও জাহেলিয়াতের বীজ উৎকীর্ণ ছিল।

রুশ দেশে কমিউনিজমের শাসন চলতো এক সময়। আল্লাহ্কে অস্বীকার করা হতো। কিন্তু তথাপি সেখানে দেবী ও দেবতাদের মূর্তি অপসারণ করার সাহস কারুর নেই।

তামিলনাড়ুতে অনেক বিদ্রোহী কবি গান গায়, সে সকাল কবে আসবে যখন এখানকার মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে খান খান করে দেয়া হবে। অথচ এখানকার অলিতে-গলিতে আমরা এখনও মূর্তি দেখতে পাই।

অথচ চৌদ্দশত বছর আগে জাহেলিয়াতের মূর্তিসমূহ কাবাঘর থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে—মানব ইতিহাসে এ হলো এক দুঃসাহসিক পদক্ষেপ। নিজের দেশের নিজের বাপদাদাদের পুজিত মূর্তিগুলোকে উপড়িয়ে ফেলা সহজ কথা নয়, আর এ জাতীয় বিপ্লবাত্মক ঘটনা মানব ইতিহাসে নবী করিম (সাঃ) নিজ হাতে আঞ্জাম দিয়েছেন।

আজ মানুষ উন্নয়নের বড় বড় দাবি করে থাকে। আল্লাহ্কে অস্বীকার ও আল্লাহ্-দ্রোহীতাকে তারা নিজেদের উন্নয়নের দলিল হিসেবে পেশ করে থাকে অথচ এখনও তারা মূর্তি ও ছবির মহব্বতে বিভোর।

এটা কেমন সূক্ষ্ম প্রতারণা যে, এই উন্নয়নকামী মহারথীরা আল্লাহ্কে তো অস্বীকার করে এবং আরো এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে এরা দেব-দেবীর মূর্তিগুলোকে বলে অহেতুক, অথচ স্বয়ং নিজেদের নেতাদের মূর্তি বানিয়ে এদের সামনে নিজেদের মাথা ঝুঁকিয়ে দেয়। তারা দেবতাদের মূর্তি সরিয়ে ফেলে সেখানে নিজেদের ছবি লাগিয়ে নেয়। মূর্তিই হোক অথবা ছবিই হোক দুটোই মানব জাতির দুর্বলতার বহিঃপ্রকাশ।

এই দুর্বলতা থেকে সতর্ককারী এবং এর থেকে মানুষকে উদ্ধারকারী আমার নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম। তিনি এ কাজ শুরু করেছেন চৌদ্দশত বছর আগেই।

আজ মূর্তি ও ছবির সাহায্য ছাড়া শুধুমাত্র জ্ঞান ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে যদি কোনো আন্দোলন চলে তবে তা হলো ইসলামী আন্দোলন। কেউ কেউ বলে থাকে, মূর্তিশিল্প ও চিত্রশিল্প না থাকলে মনোহর বৃত্তির আকর্ষণ খতম হয়ে যাবে; কিন্তু এ সকল বস্তু থেকে পাক-পবিত্র থেকে মুসলমানেরা সুন্দর থেকে সুন্দরতর স্থাপত্য শিল্পের উপহার বিশ্ববাসীকে দিয়েছে।

কল্পনাকে মূর্তি ও চিত্রের বন্দিদশা থেকে মুক্ত করে মুসলমানেরা যে কীর্তি স্থাপন করেছেন তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা এইঃ

(এক) জ্যোতির্বিজ্ঞান থেকে আধুনিক ভূগোলের উদ্ভাবন।

(দুই) এলজাবরা আবিষ্কার ও তার উন্নয়ন।

(তিন) স্থাপত্য বিজ্ঞান নিয়ে সুন্দর সুন্দর ইমারত ও মসজিদ নির্মাণ।

(চার) রসায়নবিদ্যা নিয়ে সিলভার নাইট্রেট এবং সালফিউরিকের, আবিষ্কার।

(পাঁচ) চিকিৎসা বিজ্ঞানে :

(ক) আল ফারাবীর অস্ত্রোপচার গ্রন্থ

(খ) ইবনে সিনার আল-কানুন গ্রন্থ

(গ) আলী ইবনে আব্বাসী লিখিত আল-কিতাবুল মালিকী।

(ছয়) কাব্য রচনায়ঃ মুতানাব্বী যুগ থেকে নিয়ে ইকবাল পর্যন্ত সুন্দর সুন্দর

স্বচ্ছ চিন্তার এক বিশাল তরঙ্গ সৃষ্টি হয়েছে।

(সাত) সাহিত্য রচনায়ঃ আলিফ লায়লা, লাইলি মজনু, আমদ জুল জুম্মার মত সাহিত্যভাণ্ডার মানব জাতি পেয়েছে।

কেউ কেউ প্রশ্ন করতে পারে, অন্যান্য জাতি কি এধরনের গৌরবের কীর্তি রাখতে পারেনি? উত্তরে বলা যেতে পারে, এত বেশী না।

আরো একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য বলা যায়, এই শিক্ষাগুলো নিয়ে উত্থিত জাতির আবির্ভাব এমন একটি মরু অঞ্চল থেকে হলো যেখানে উত্তপ্ত রৌদ্রের তীব্রতা ছিল, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত দৃশ্যাবলী ছিল সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। এতদ্‌সত্ত্বেও এ জাতি বিশ্ববাসীকে সুন্দর ও সৌন্দর্যের এত কিছু উপহার দিল।

হ্যাঁ, এক নিরক্ষরের শিক্ষাই এই সব কিছু করলো এবং বিশ্বমানবতাকে শ্রেষ্ঠত্বের উচ্চতম ধাপে পৌছিয়ে দিল।

ইসলাম আমার ভালোবাসা

ধর্মীয় নেতাদের প্রতি সাধারণ মানুষ সহজে বিশ্বাস আনতে চায়না। বহু ধর্মীয় নেতা অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক বস্তুর প্রদর্শনী করেছেন, যা দেখে সাধারণ মানুষের মন-মগজ তাদের প্রতি বিশ্বাস আনতে বাধ্য হয়েছে।

আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনার ব্যাপারেও অনেক সম্প্রদায় অলৌকিকত্বের ওপর নির্ভরশীল। আসল কথা হচ্ছে, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ একথা না মানবে যে, নেক মানুষের জন্য চিরস্থায়ী পবিত্র জীবন এবং অসৎ মানুষের জন্য ভয়াবহ ক্ষতি নির্ধারিত আছে ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষের নেক ও পবিত্র জীবন নির্বাচন করে দৃঢ়তার সাথে সামনে অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর নয়।

এই উদ্দেশ্য হাসিল এবং একথাগুলোকে ভালোভাবে উপলব্ধি করার জন্য আমাদেরকে বেদ, পুরাণ, ও নতুন পুরাতন 'আহদ নামায়' ধর্মের দিকে আহবানকারী নানা রকমের অস্বাভাবিক উপায় দেখানো হয়েছে।

এই সকল অস্বাভাবিক ও আশ্চর্যজনক অবস্থা ছাড়াই যদি কোনো পাক পবিত্র কারো জীবনচরিত পাওয়া যায় তবে তা নিঃসন্দেহে নবী করিম (সাঃ)-

এরই জীবনচরিত।

শুধু এতটুকুই নয় বরং যখন তাঁর কাছে অতি প্রাকৃত কোনো জিনিস চাওয়া হয়েছে তখন তিনি তার জবাবে কুরআনুল করিমকে পেশ করে দিয়েছেন। প্রকাশ্য মোজেযা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থেকে জ্ঞান ও বুদ্ধির দিকে দাওয়াত দানকারী বিপ্লবী ব্যক্তিত্ব একমাত্র নবী করিম (সাঃ)।

আর একটি দৃষ্টিকোণ থেকে নবী (সাঃ)-কে দেখা যায়; তিনি ধর্মীয় পথ প্রদর্শকও ছিলেন, আবার যুদ্ধের ময়দানে সেনাপতিও ছিলেন। জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দানকারীও ছিলেন, আবার চিন্তাশীল অভিজ্ঞ পথ প্রদর্শকও ছিলেন— এই উভয় বৈশিষ্ট্য একমাত্র তাঁর জীবনেই সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়। বদর প্রান্তরে ঘোরতর যুদ্ধের সময়েই হোক বা বনু কায়নুকার দুর্গ অবরোধের সময়েই হোক; গাজওয়ায়ে সবিই হোক বা গাজওয়ায়ে ওহুদই হোক; গাজওয়ায়ে তবুকই হোক বা গাজওয়ায়ে খায়বর— প্রতিটি জায়গায় সংকটময় মূহুর্তে তিনি একজন বিজ্ঞ ও সাহসী জেনারেলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

ধর্মীয় পথ প্রদর্শক এবং সাথে সাথে একটি বাহিনীর প্রধান সেনাপতি; এ দুটো গুণ যদি একই সময় কোথাও পাওয়া যায় তবে সেটা তাঁরই জীবনাদর্শে; অন্যের নয়। যুদ্ধ এবং সমরনীতিতে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তিনি ঈমান ও আকিদার ওপর বলীয়ান হয়ে যে সাহসের সঞ্চার তাঁর সাথীদের মধ্যে করেছেন সেটা ইতিহাসের একটি উজ্জ্বল ঘটনায় পরিণত হয়েছে।

তিনি যুদ্ধ করেছেন তবে দেশ জয়ের উদ্দেশ্যে নয়, আবার প্রতিপক্ষকে পায়ের নিচে রাখার জন্যও নয়। শুধুমাত্র সত্যের প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর লক্ষ্য; এবং এজন্যই এটাকে জিহাদ নামে অভিহিত করা হয়েছে। এবং এই জিহাদে নিজ প্রাণ, প্রাণের মালিকের কাছে সমর্পণ করা বীরদের শহীদ নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। শহীদের অর্থ হলো নিজের জীবন উৎসর্গ করে সত্যের সাক্ষ্য হওয়া।

যুদ্ধের ময়দানে ঘাবড়িয়ে যাওয়া, ছুটে আসা তীরের ভয়ে পলায়ন করা অর্থ দোজখী হওয়ার ঠিকানা। এই হলো জিহাদ সম্পর্কে রসুলের মহান শিক্ষা, যার ফলে রসুলের সাহাবীরা বেপরোয়া ও সাহসিকতা সহকারে সত্যের দাওয়াত স্পেন থেকে চীন পর্যন্ত পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। নবী করিম

(সাঃ)-এর শিক্ষা থেকে যখনই মুসলমানেরা দূরে সরে পড়লো তখন থেকেই শুরু হলো পতন। এর আগে মুসলমানেরা কখনও পরাজয়ের মুখ দেখেনি।

রসূলের যুগে রোম ছিল একটি পরাশক্তি। কিন্তু রসূল (সাঃ)-এর নির্ভিকতা এবং সুদৃঢ় বিশ্বাসের নিকট রোমের এই শক্তিও টিকে থাকতে পারেনি। হ্যাঁ, এই সেই মুহাম্মদ (সাঃ) যিনি মরুভূমিতে জন্মগ্রহণ করা ও সেখানেই লালিত পালিত হওয়া একটি দরিদ্র মানুষ ছিলেন; এবং অতঃপর বিশ্বমানবতার শ্রেষ্ঠ নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হলেন।

যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জামের ক্ষেত্রে চামড়ার লাগাম পর্যন্ত তাঁর জোটেনি। বাধ্য হয়ে কাপড় নির্মিত লাগাম যুদ্ধের ঘোড়াগুলোকে পরানো হতো। একদিকে যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জামের এই দুরবস্থা, অপর দিকে বিশাল রোম সাম্রাজ্যের সামরিক অস্ত্রসম্ভার। এ দুয়ের কি মোকাবেলা হবে।

তথাপি স্বীয় নীতির ওপর সুদৃঢ় থেকে নবী (সাঃ) ও তাঁর সাহাবারা আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কাল করে মোকাবিলা করেছেন এবং বিজয়ী হয়েছেন। একদিকে দুনিয়াত্যাগী দরবেশদের চেয়েও অধিক ক্লেশমুক্ত এবং সরল প্রকৃতির ছিলেন তিনি; অপরদিকে আরব ও তার সন্নিকটবর্তী চতুর্দিকের সকল ঐশ্বর্যশালী রাজন্যবর্গ— এতদসত্ত্বেও রসূল (সাঃ)-এর জীবন ছিল অত্যন্ত সাদাসিধা। তাঁর গৃহ ছিল নিতান্ত মামুলি ধরনের। তাঁর জীবনযাত্রার মান আমীর ওমরার জীবনযাত্রার মত ছিল না। তাঁর খাদ্যও ছিল মামুলি। কোনো কোনো সময় তাঁকে উপবাস পর্যন্ত করতে হতো যা স্মরণ করলে আমাদের চোখ অশ্রুতে ভরে যায়। আর এই হলো দীন ইসলামের বিশেষত্ব, যার তিনি ছিলেন পূর্ণ ধারক, বাহক এবং আহবায়ক। এ জন্যই আমি মনে করি, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ ও শাশ্বত জীবনাদর্শ; যার তুলনা আর কোনো মতাদর্শে নেই।

হযরত ঈসা (আঃ) কি আল্লাহর পুত্র?

পূর্বের আলোচনায় আমি বলেছি, নবী (সাঃ) মূর্তির উৎপাটন ও ছবি ছটিয়ে দেয়ার এক বিরাট বিপ্লবী কাজ আঞ্জাম দিয়ে গেছেন। মানবেতিহাসের আর একটি বিপ্লবী কাজ তাঁর হাত দিয়ে সংঘটিত হয়েছে।

পিতা, পুত্র ও পবিত্রাত্মার ত্রিত্ববাদ ঈসায়ীদের বুনিয়াদী বিশ্বাসের অন্যতম। পাপীদের মুক্তি দেয়া এবং মানুষের সকল পাপের শাস্তি নিজে ভোগ করে শূলে হযরত ঈসা (আঃ) নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন; আবার তৃতীয় দিনে জীবিত হয়ে পিতার ডান দিকে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, এই হলো ঈসায়ীদের বিশ্বাস—

একঃ হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহর পুত্র

দুই ঃ তিনি মরার পর আবার জীবিত হয়ে উঠেছেন।

ওপরোক্ত দুটো কথা না মানলে মানুষ ঈসায়ী হতে পারে না। এই দুটো বিশ্বাস ঈসায়ী দুনিয়ায় ছড়িয়ে আছে যে, নবী (সাঃ) প্রেরিত হয়েছেন এবং তিনি এ দুটো বিশ্বাসকে বাতিল ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেনঃ হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহর পুত্র নন বরং তাঁর নবী ছিলেন। আসল কথা হলো তিনি শূলবিদ্ধ হননি, তাঁকে গ্রেফতার করার জন্য যখন একদল লোক তাঁর কামরায় প্রবেশ করলো, তখন তাদের মধ্যে এক ব্যক্তিকে তাঁর আকৃতির মতো দেখা গেল এবং এই সমআকৃতির লোকটিকে শূলে চড়ান হলো। কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছেঃ "প্রকৃতপক্ষে না তাঁকে কতল করেছে না শূলে চড়িয়েছে বরং ব্যাপারটি করে দেয়া হলো সন্দেহজনক"।

বাইবেলে যে সমস্ত নবীর কথা পাওয়া যায় তা সবই কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে। যেমন হযরত আদম, ইব্রাহিম, ইসহাক, ইসমাঈল, ইয়াকুব, ইউনুস, মূসা, হারুন, দাউদ, সোলায়মান, ইউনুস, ইলিয়াস, জাকারিয়া প্রমুখ। এই নবীদের সংগে হযরত ঈসা (আঃ)-এর নামও নেয়া হয়েছে। কুরআনে স্পষ্ট বলে দেয়া হয়েছে যে, হযরত ঈসা (আঃ) একজন নবী ছিলেন, তাঁর মধ্যে খোদায়িত্বের বিন্দু-বিসর্গও ছিলনা। ঈসায়ী ও মুসলমানদের এই ব্যাপারে কি মতপার্থক্য আছে এখানে তা আলোচ্য বিষয় নয়। আমি যে দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপারটি দেখছি তা হলো, সেই যুগে ধর্মের ছড়াছড়ি ছিল, যা সেই সময় একটি বিশাল শক্তি হিসেবে দুনিয়ায় বর্তমান ছিল। তাদের ভ্রান্ত ধারণার বিরুদ্ধে নবী (সাঃ) কোনো বন্ধু ছাড়াই আওয়াজ তুললেন, অথচ এই তুমুল বিতর্কে হযরত ঈসা (আঃ)-এর মান-মর্যাদার কোনো ক্ষতি হলোনা।

হযরত ঈসা (আঃ)-এর হাত রুহুল কুদুস দ্বারা শক্তিশালী করা হয়েছিল। তাঁরই মারফৎ তাঁকে ইনজিল দান করা হয়েছিল। এ দুটোর হাকিকত কুরআন অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় গর্ব ও মর্যাদার সংগে বর্ণনা করেছে। এভাবেই অন্য ধর্মসমূহের ভুলগুলো কুরআনুল করিম অস্বীকার করেছে ঠিক, কিন্তু তাদের ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের সম্মান দেখানোর শিক্ষাও দিয়েছে। (ক) ভুল বিশ্বাসের অপনোদন, (খ) ব্যক্তিত্বের মর্যাদা। এ দুটো কথাকে ইসলাম একাকার করেনি বরং পরিষ্কার ভাষায় এ দুটো বিষয়ের শিক্ষা ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছে।

জরুরী অবস্থার প্রাক্কালে আমাকে মিথ্যা মামলার অজুহাতে জেলে ঢুকানো হয়েছিল। সে সময় দুনিয়ার বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করার সুযোগ আমার হয়েছিল। আমার আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবেরা এবং কিছু কিছু মুসলমান বন্ধু-বান্ধব আমার কাছে এই পবিত্র গ্রন্থগুলো পৌঁছিয়েছিলেন।

এ সমস্ত গ্রন্থ অধ্যয়নের পর যে গ্রন্থে আমি খুব বেশী আকর্ষিত হয়েছি এবং যা আমার দৃষ্টিতে আমাকে যাচাই করেছে। সে কিতাব হলো কুরআন মজিদ।

কুরআনের স্বতন্ত্র গুণাবলী

বিভিন্ন ধরনের ধর্মগ্রন্থ পাওয়া যায়। এসবের মধ্যে প্রত্যেকটির আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে। হিন্দুধর্মের সবচেয়ে পবিত্র গ্রন্থ হলো বেদ। বেদ মুনি ও ঋষিদের স্রষ্টা সম্পর্কে গাওয়া গীতের সমষ্টি। ঈসায়ীদের ইঞ্জিল এবং ইহুদীদের তৌরাতের অংশগুলো প্রকৃত পক্ষে মানুষের হাতের লেখা নবীদের ইতিহাস ও কার্যাবলী। এভাবে যত ধর্মগ্রন্থই পড়ুন না কেন, হয় সেটা কোনো বুজুর্গ ব্যক্তির আল্লাহর উদ্দেশে গাওয়া গীত অথবা মানুষের লেখা নবী বা বুজুর্গ ব্যক্তিদের কার্যাবলীর সমষ্টি।

কুরআনের বেলায় ঠিক তার উল্টো, এটা নবী (সাঃ)-এর হাতের লেখা গ্রন্থ নয় এবং আল্লাহর মহিমা সম্পর্কে গাওয়া মানুষের কোনো গীতেরও সমষ্টি নয়। কুরআনের অবস্থান শুধুমাত্র কোনো ইতিহাস গ্রন্থ হিসেবে নয়, বরং আল্লাহ্‌'তায়ালা লওহে মাহফুজে যে মর্যাদাপূর্ণ কিতাব সুরক্ষিত করে রেখেছিলেন সেটাই হলো কুরআনুল করিম।

লওহে মাহফুজের সেই কিতাব থেকে মহাসম্মানিত ফেরেশতা হযরত জিবরাইল (আঃ) কিছু কিছু করে সময়ে সময়ে নবী (সাঃ)-এর কাছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে পৌঁছিয়েছেন, এই হলো মুসলমানদের আক্বিদা। কুরআনুল করিম মানবরচিত কিতাব নয় বরং অবতীর্ণ কিতাব। এ কিতাবের আরো অনেক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এর শব্দমালার স্বর ঝংকারে হয়েছি আমি মুগ্ধ। আওয়াজ কি কোনো পবিত্রতা হাসিল করতে পারে? আমি বলবো হ্যাঁ। আওয়াজই দুনিয়ার ভিত্তি। বেদ বলে ঃ আদমের আওয়াজেই দুনিয়ায় সৃষ্টির সূচনা।

বাইবেলের কথা হলো, সবার আগে আল্লাহ্‌র কলেমা ছিল—তারপর এই দুনিয়া হলো। কুরআনুল করিমের রচনা শৈলী যেখানে সুন্দর গদ্যের শব্দ সম্ভারে সমৃদ্ধ সেখানেই সে নিজের ভেতরে এক সুন্দরতম কবিতার ঝংকার নিয়ে অবস্থান করছে। এক সুন্দরতম দৃশ্যের সৌন্দর্য এর ভেতরে শোভা পাচ্ছে। গদ্য ও পদ্যে সুষমামণ্ডিত বিশ্বের সৌন্দর্যের সমষ্টিগুলো কুরআনুল করিমের আওয়াজ।

এই কালাম কি এতই সুন্দর যে, এর সমকক্ষ কোনো কালামই আনা সম্ভব নয়? এ প্রশ্ন আজও করা যায়, আর সে যুগেও করা হয়েছিল যখন কুরআন অবতীর্ন হচ্ছিল। কুরআন এ প্রশ্নের উত্তর তখনই দিয়ে দিয়েছে যে, যদি পার তবে এ ধরনের কালাম নিয়ে আস। এই চ্যালেঞ্জের জওয়াব দুনিয়া আজ পর্যন্ত দিতে অপারগ। এর চেষ্টা যেই করেছে সেই নিজের মুখ পুড়েছে।

কুরআনে এরশাদ হচ্ছে ঃ আমি তোমাকে কাওসার দান করেছি, অতঃপর তুমি তোমার প্রভুর উদ্দেশে নামায পড়, কুরবানী কর; নিশ্চয়ই তোমার দুশমনেরাই ছিন্নমূল হবে। (সূরা আল কাওসার)

এমনি করে সৌন্দর্য ও সৌকর্যে ভরপুর আয়াত এ কিতাবে সন্নিবেশিত হয়েছে। যার মুকাবিলায় দক্ষ আরবী কাব্যবিদেরা সে সময় চেষ্টা করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত নিজেদের পরাজয়ের স্বীকারোক্তি করেছিলেন এ ভাষায়ঃ 'মা হাজা কালামুল বাশার'— এটা মানুষের কথা হতে পারে না।

কুরআন চ্যালেঞ্জ করলো ঃ বলে দাও যে, মানুষ ও জ্বীন সবাই মিলে যদি

কুরআনের মত জিনিস সরবরাহ করার চেষ্টা করে তবুও তা পারবেনা তারা সবাই মিলে একে অপরকে সহযোগিতা করলেও। কুরআন মজিদের মধ্যেই তার নিম্নলিখিত নামগুলো পাই, এসমস্ত বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী এবং বড় বড় তত্ত্বের প্রকাশকঃ

আল কিতাব — গ্রন্থ
হাবলুল্লাহ — আল্লাহ্‌র রুজ্জু
আল বায়ান — খুলে খুলে বর্ণনাকারী
আল বুরহান — প্রকাশ্য দলিল
আল মুহাইমিন — হিফাজতকারী
আল মুবারক — বরকতওয়ালা
আল মুসাদ্দিক — সত্যতা বিধানকারী
আজ্ জিক্‌রা — উপদেশ দানকারী
আন্ নুর — আলো
আল বাসাইর — দৃষ্টিদানকারী
আল হুদা — সোজা রাস্তা প্রদর্শনকারী
আর রাহমাত — রহমত
আশ্ শিফা — আরোগ্যদানকারী
আল মাওয়েজাহ — উপদেশ দানকারী
আল হাকাম — আদেশদাতা
আল মুবিন — সুস্পষ্ট
আল আরাবী — আরবী ভাষায় লিখিত
আল হিক্‌মাহ — জ্ঞান বিজ্ঞানে ভরপুর
আল হাক্ব — সত্য

আল কায়্যেম — সুদৃঢ়
আল ফুরকান — সত্য মিথ্যার পার্থক্য বিধানকারী
আত তানজিল — অবতীর্ণ
আল হাকিম — বিজ্ঞানময়
আজ জিক্‌র — স্মরণকারী
আল বাশির — খোশ খবরদানকারী
আন নাজির — ভীতি প্রদর্শনকারী
আল আজিজ — শক্তিশালী
আর রূহ — জীবন্ত
আল মাজিদ — সম্মানিত
আল করিম — মর্যাদাশীল
আল মুকাররামা — সম্মানিত
আর আজিব — বিস্ময়কর
আল মারফুয়াহ — উঁচু
আল মুতাহ্‌হারা — পবিত্র
আন নিয়ামত — নিয়ামত।

এ ছাড়াও কুরআনের আরেক অর্থ পঠিতব্য।

হ্যাঁ এটাই পড়ার উপযোগী কিতাব। দুনিয়ায় সবচেয়ে অধিক পঠনশীল কিতাব।

নিরক্ষর নবী

আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ কিতাবের প্রথম পাঠক ছিলেন নিরক্ষর অর্থাৎ তিনি লেখাপড়া জানতেন না। উম্মী (নিরক্ষর) অর্থ বুদ্ধিহীন ও অবুঝ নয়। লেখাপড়া না জানা সত্ত্বেও যারা তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি তাদেরকে বলা হয় উম্মী।

তামিলসাহিত্যে এই বর্ণনা প্রসিদ্ধ যে, কবিতা একবার শোনে আবৃত্তিকারী, দ্বিতীয়বার শোনে আবৃত্তিকারী, তৃতীয়বার শোনে আবৃত্তিকারী এবং চতুর্থবার শোনে আবৃত্তিকারী। এদের সকলের পর্যায়ক্রমিকভাবে প্রশংসা করা হতো। কিন্তু আরব দেশে শত সহস্র কবিতা মুখস্ত অনর্গল বলতে পারে এমন ব্যক্তিকে বলা হয় উম্মী।

শুধু কবিতাই নয়; শরীরচর্চাবিদ্যার কোনো কোনো ব্যক্তি এমন তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তিসম্পন্ন পাওয়া যায় যে, তা দেখে হতভম্ব হতে হয়। ২১৪ কে ৩১৪ দ্বারা গুণ করলে লেখাপড়া জানা ব্যক্তি অনেকক্ষণ পর তার সমাধান বের করতে পারবে, কিন্তু কোনো কোনো এমন তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তিধারী ব্যক্তি যারা সাধারণত লেখাপড়া জানেনা, তৎক্ষণাৎ তার সমাধান করে দিতে পারে। এভাবে বংশতালিকা ইত্যাদি কয়েক পুরুষ পর্যন্ত ফুর ফুর করে শোনাতে পারা ব্যক্তি আরবে মওজুদ ছিল যারা লেখাপড়া জানতো না।

উম্মী অর্থ মুর্খ নয়। যদি এই অর্থ নেয়া যায় তাহলে নবী (সাঃ)-এর ব্যবসা-বাণিজ্য, ধীশক্তি এবং অনেক ঘটনার কোনো ব্যাখ্যা করা যেতে পারে না। তিনি লেখাপড়া জানতেন না কিন্তু অত্যন্ত তীক্ষ্ণস্মৃতি ও উচ্চমানের মেধার অধিকারী ছিলেন। এটাই ছিল তাঁর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য যে, যখন তাঁর ওপর ওহি অবতীর্ণ হলো তখন তিনি ওহির সকল বাণী হুবহু হিফজ করে দাড়ি, কমা, সেমিকোলন পর্যন্ত শুনিয়ে দিতেন।

নবী (সাঃ) আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রাপ্ত ছিলেন। তাঁর সাহাবাদের ওপর ছিল আল্লাহ্‌র খাশ রহমত। তাঁরা নবী (সাঃ)-এর মুখনিঃসৃত ওহির কথাগুলো মুখস্ত করে ফেলতেন। সম্পূর্ণ কুরআন মজিদ মুখস্তকারীদের আজও আমরা যখন তেলাওয়াত করতে দেখি, তখন তাদের যোগ্যতা ও ক্ষমতার ওপর

আমাদের ঈর্ষা হয় এবং সংগে সংগে কুরআন পাকের অলৌকিকত্বের প্রতিও অবাক হতে হয়। হাঁ একজন উম্মী ব্যক্তিই এত বড় কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন এবং বিশ্বাস যোগ্যতার বিকাশ সাধন করেছেন।

আরবদেরকে সাধারণভাবে অজ্ঞ, মুর্খ, মুর্খতায় নিমজ্জিত, হত্যা ও ধ্বংসের পুরোধা, বে-আক্কেল ও দুশ্চরিত্র বলা হয়ে থাকে। এইসব কথা অবান্তর। হাজার হাজার বছর আগে দুনিয়ার অপর প্রান্তে যারা বসবাস করতো তাদের মধ্যে যে সমস্ত গুণাবলী ও দুর্বলতা ছিল আরবদেরও সে সমস্ত গুণাবলী ও দর্বলতা ছিল; এতদসত্ত্বেও আরবদের একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তারা বেশী লেখাপড়া জানতো না ঠিকই, কিন্তু তাদের স্মৃতিশক্তি ছিল আশ্চর্যজনক ও অসাধারণ। অন্যান্য দেশের মানুষদের স্মৃতিশক্তি তাদের তুলনায় অনেক কম ছিল। শুধু শিক্ষা না থাকলেই জাহিলিয়াত আসতে পারে না। আরবদের চেয়েও মারাত্মক জাহিলিয়াতের নমুনা পৃথিবীর বহু দেশে যে ছিল এর কোনো ইয়ত্তা নেই।

মানুষের মাথা মুণ্ডন করে দুর্গের দেয়ালে লটকানো হতো। জীবিত মানুষকে বেঁধে তার ওপর দেয়াল ধসিয়ে দেয়া হতো। হাতীর পায়ের নীচে মানুষকে পিষ্ট করা হতো। শূলে চড়িয়ে মানুষের দেহে পেরেগ মারা হতো। জীবিত মানুষকে কবর দেয়া হতো। চুনের স্তূপে মানুষকে ধসিয়ে দেয়া হতো। ক্ষুধার্ত বাঘের সামনে শিকারের মত নিক্ষেপ করা হতো। রোম থেকে নিয়ে তামিলনাড়ু পর্যন্ত এসকল দৃশ্য ইতিহাসের পাতায় আমরা দেখতে পাই। আরবের জাহিলিয়াত কি এর চেয়েও বড় ছিল বলা যায়? সুতরাং এটা একটা চূড়ান্ত অনর্থক অপবাদ যা আরবদের প্রতি দেয়া হতো। আরবেরা নবী (সাঃ)-এর দাওয়াতের বিরোধিতা করেছিল। তাঁকে কষ্ট দিয়েছিল এ কথা বলা হয়। কিন্তু মদীনার লোকেরাও আরব ছিলেন যারা হুজুর (সাঃ)-এর বন্ধুত্বের হক আদায় করেছেন, তাঁর জন্যে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাঁরই নেতৃত্বে বিভিন্ন জায়গায় নিজেদের জীবনকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে লড়াই করেছেন।

কাবা ঘরে রক্ষিত মূর্তি হটানো এবং তাদের পূজারীদের বাতিল ঘোষণা করার বিপ্লবী কাজও নবী (সাঃ)-এর নেতৃত্বে আরবদের দ্বারাই সম্পন্ন হয়েছিল।

চৌদ্দশত বছর আগে এই বিশাল বিপ্লব যদি হিন্দুস্তান, চীন অথবা অন্য কোনো দেশে আনা হতো, তবে সেখানকার জনগণও এ ব্যাপারে সৌভাগ্যশালী হতে পারতো। এই দৃষ্টিকোণ থেকে যখন আমরা আরবদের দেখি তখন তাদের শ্রেষ্ঠত্ব আমাদের কাছে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। আরব দেশ ছিল এক মরুভূমির দেশ। আর এই মরুভূমিতেই এই মহান বিপ্লব সাধিত হলো। এই কারণেই আমি সেই দেশ ও এর বাসিন্দাদের সম্মান ও সম্ভ্রমের চোখে দেখে থাকি। আমার শত সহস্র সালাম রইলো তাদের প্রতি।

কুরআন একটি প্রাণবন্ত কিতাব

বেদ, বাইবেল এবং অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ ও কুরআন শরীফের মধ্যে বিরাট পার্থক্য বর্তমান। হিন্দুধর্মের বুনিয়াদী গ্রন্থ হলো চারখানা বেদ। এই বেদগুলোর ভাষা হলো সংস্কৃত। সংস্কৃত অর্থ নতুন ভাষা এবং একটি মিশ্র ভাষা। যদি এটা মানা যায় যে, বেদ মানুষ সৃষ্টি লগ্ন থেকে পেয়েছে, যেমন অনেকেই এ ধারণা পোষণ করে, তাহলে এর অর্থ এ দাঁড়ায়, আসলে তা সংস্কৃত ভাষায় আসেনি বরং অন্য কোনো ভাষায় এসেছিল। পরবর্তী কালের ভাষায় বেদ লেখা হয়েছে। এটা অনস্বীকার্য যে, মূল বেদ এবং নতুন ভাষায় লিখিত বেদের মধ্যে পার্থক্য হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু কুরআনুল করিম আরবী ভাষায় নাযিল হয়েছে এবং আজও অবিকল সেই ভাষায় আমাদের কাছে বর্তমান আছে।

ইহুদীদের তৌরাতের দিকে তাকান। এর নাযিল হওয়ার পর কয়েক শতাব্দী পরেই ইসরাঈলীরা তার পরিবর্তন ঘটিয়েছে। মোদ্দাকথা হচ্ছে, তৌরাত হযরত মূসা (আঃ)-এর ওপর ইবরানী ভাষা নাযিল হয়েছিল। বহু শতাব্দী পর তা লিখিত হয়েছে। আবার লিখিত এই সংকলনটি নষ্ট হয়ে গেছে। ল্যাটিন এবং ইউনানী ভাষার বাইবেলই শুধু অবশিষ্ট আছে। আবার এই ভাষার তৌরাতের তরজমা থেকে ইসরাঈলীরা আবার ইবরানী ভাষায় এর অনুবাদ করেছে। এভাবে তরজমা থেকে আসল ভাষায় ফিরিয়ে নেয়া কিতাবের কি অবস্থা হতে পারে তা সকলের বোধগম্য। মৃত সাগরের কাছে 'গারে কামরাণে' ইবরানী ভাষায় লিখিত যে কাগজগুলো পাওয়া গেছে তাও শুধু বাইবেলের

বিক্ষিপ্ত কিছু অংশ মাত্র। এই হলো বাইবেলের অতি সাম্প্রতিক পর্যালোচনা। মূলভাষায় নাযিলকৃত গ্রন্থসমূহের মধ্যে একমাত্র কুরআনুল করিমই আজ পর্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। এই বৈশিষ্ট্যের দাবি আর কোনো গ্রন্থের নেই।

হযরত ঈসা (আঃ)-এর ওপরে অবতীর্ণ কিতাব সুরয়ানী ভাষার এক ভাষ্য 'আরামী 'ভাষায় ছিল। কিন্তু প্রথমেই তা লিখিত হলো ইউনানী ভাষায়। অতঃপর ইউনানী থেকে ল্যাটিন ভাষায় তরজমা করা হলো; এরপর অন্যান্য ভাষায়। এভাবে বাইবেলও তার নিজস্ব ভাষায় বর্তমান নেই বরং তরজমার ভাষায় আমাদের কাছে আছে। অথচ কুরআন যে ভাষায় নাযিল হয়েছিল সে ভাষাতেই আজও আমাদের সামনে বর্তমান। কুরআনের আরো একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে চিন্তা করুন —

০ হিন্দুধর্মের বেদ তার নিজস্ব ভাষা বাদ দিয়ে সংস্কৃত ভাষায় লিখা হলো, কিন্তু সংস্কৃত ভাষা এখন একটি মৃতভাষা হিসেবে পরিচিত।

০ ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থের ভাষা ইবরানীও কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত চালু ছিল না। ইসরাঈলীরা আবারো এ ভাষাকে জনগণের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে।

এমনি করে হযরত ঈসার ভাষা আরামী ও গৌতম বুদ্ধের ভাষা পালিও আর প্রচলিত নেই। যে যে ভাষায় ঐশী গ্রন্থগুলো নাযিল হয়েছিল এইসব ভাষাগুলো এখন মৃত। পক্ষান্তরে একমাত্র কুরআনের ভাষাই এখন চালু ভাষা হিসাবে জীবন্ত কিতাবের মর্যাদা নিয়ে আমাদের কাছে আছে। কুরআন মজিদের আরো একটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে চিন্তা করুনঃ

০ চার বেদ

০ ইহুদীদের কিতাব তৌরাত

০ হযরত মসির (আঃ)-এর ইঞ্জিল

০ গৌতম বুদ্ধের তাম্বাবুলম

এই সমস্ত গ্রন্থ যে মহান ব্যক্তিরা পেয়েছিলেন এই মহান ব্যক্তিদের মৃত্যুর অনেক পরে এই গ্রন্থগুলোর লিখন ও সংকলন হয়েছিল অথচ শুধু কুরআনই সেই কিতাব যা তাৎক্ষণিকভাবে সংকলন করা হয়েছিল এবং

যখনই এর কোনো আয়াত নাযিল হতো তখনই তা সংকলিত করে লিখে রাখা হতো।

নবী করিম (সাঃ) এ কাজের দেখাশোনা করতেন এবং এব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন। হুজুর (সাঃ)-এর ওফাতের পরেই প্রথম খলিফা আবু বকর সিদ্দিক হুজুর (সাঃ)-এর দেখানো নিয়ম অনুযায়ী সম্পূর্ণ কুরআনকে একটি খন্ডে একত্রিত করে দিলেন। এ কাজ তিনি কুরআন হিফাজতের দৃষ্টিভংগী সামনে রেখেই করলেন। যখন কুরআন নাযিল হতো নবী (সাঃ)- এর সাহাবীরা তখন তা চামড়া এবং গাছের পাতায় লিখে রাখতেন এবং নবী (সাঃ)-কে শুনিয়ে নিতেন। এভাবেই সঠিক পদ্ধতিতে কুরআন লিখার দিকে পূর্ণ যত্ন নেয়া হতো।

যখনই এ কিতাব নাযিল হচ্ছিল তখনই ঠিক ঠিকভাবে লিখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এত যত্ন ও নিখুঁতভাবে লিখিত কিতাব শুধু মাত্র কুরআনুল করিম।

কুরআন সার্বজনীন গ্রন্থ

কুরআনুল করিমের সকল আয়াতই আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। বেদে স্রষ্টার প্রশস্তিমূলক শ্লোকসমূহে মানুষের গীত সংমিশ্রিত হয়েছে। তৌরাতে বনী ইসরাঈলের ইতিহাস এবং নবীদের উপদেশসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ইঞ্জিলে ইতিহাসও আছে এবং নবী ও নেককার মানুষের উপদেশও আছে।

কিন্তু কুরআন শরীফের সকল আয়াতই আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত। মানুষের সংশোধনের জন্য, মানুষকে গাফলতি থেকে সজাগ করার জন্য, মানুষের উপদেশের জন্য এখানে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী, আত্ম ও আধ্যাত্মের প্রতি ইশারা এবং জ্ঞান ও বিজ্ঞানে ভরপুর উপদেশাবলী এখানে পাওয়া যায়। কিন্তু এতসব কিছুই আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। নবী (সাঃ) অথবা অন্য কারো পক্ষ থেকে সেখানে বিন্দুমাত্র কোনো কিছু সংযোজিত হয়নি। নবী (সাঃ)-এর সকল কথা, কাজ এবং উপদেশাবলী আলাদাভাবে সংরক্ষিত হয়েছে। এসবের মধ্যে কোনো একটি জিনিসও কুরআনে শামিল করা হয়নি।

এইভাবে সকল প্রকারের মিশ্রণ ছাড়াই আল্লাহ্‌র শব্দাবলীর সমষ্টিই হলো কুরআনুল করিম। অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ কিছু বিশেষ শ্রেণীর লোকদের পড়ার জন্য হয়ে থাকে। যথাঃ ব্রাহ্মণ, আচার্য এবং ভীক্ষু ইত্যাদি।

বেদের আরেক অর্থ কোনো জিনিস গোপন করা অর্থাৎ যা সাধারণ মানুষের দৃষ্টির আড়ালে রাখা উচিৎ। আল্লাহ্‌র বাণী তাঁর সকল বান্দার জন্য অবারিত; বিনা বাধা-বিপত্তিতে সাধারণ ও বিশেষ সবাইর জন্য উন্মুক্ত। সবারই পড়ার জন্য সবারই মুখস্ত করার জন্য, এ ঘোষণা শুধু কুরআন পাকই দেয়। কুরআনের অগণিত হাফিজ সব দেশেই সব যুগেই ছিল; এই বৈশিষ্ট্য শুধু কুরআনই অর্জন করতে পেরেছে।

ইতিহাস থেকে জানা যায়,কোনো কোনো মানুষকে বেদ পড়া বা শোনার অপরাধে শাস্তি যোগ্য মনে করা হয় এবং শাস্তিও দেয়া হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে কুরআনের সুমহান বৈশিষ্ট্য হলো, কুরআন স্বয়ং ঘোষণা করছে যে, এটা আল্লাহ্‌র কালাম, প্রত্যেক মানুষের জন্য কুরআন শোনা অপরিহার্য্য এবং সমানজনক।

ইতিহাস থেকে এও পাওয়া যায় যে, তুরকোতিও মন্দিরের পাশে বেদ পড়ার অপরাধে রামানুজকে শাস্তি দেয়া হয়েছিল।

কুরআনের শিক্ষা তো এটাই যে, অন্যের জন্য কুরআন বোঝার সুযোগ করে দিতে হবে যাতে করে তারা আল্লাহ্‌র কালাম শুনে হিদায়াত পাওয়ার সৌভাগ্য লাভ করতে পারে।

বেদের ব্যাখ্যাতা আদম শংকর তার মায়ের মৃত্যুর সময়ে সমাজের বয়কটের সম্মুখীন হয়েছিল। অপর পক্ষে কুরআন পাঠকারী হযরত আলী (রাঃ)-কে 'জ্ঞানভাণ্ডার' খেতাবে ভূষিত করা হয়েছিল।

আল্লাহ্‌র কিতাব তার বান্দাদের জন্যেই। মানুষের তা অবশ্যই পড়া উচিত। এই আবশ্যকতার শিক্ষা জোরেসোরে একমাত্র ইসলামই দিয়েছে। এই শিক্ষা এবং তাকিদের ফল এই দাঁড়ায় যে, কুরআন বিকৃত হওয়া থেকে বেঁচে যায়। আজ মরক্কো থেকে ইরাক পর্যন্ত বিশ কোটি মানুষের মুখের ভাষা হলো আরবী, যা কিনা কুরআনের ভাষা। কুরআন দুনিয়ার মানুষকে জীবনের সন্ধান

দিয়েছে এবং সাথে সাথে আরবী ভাষাকে একটা জীবন্ত ভাষার রূপ দান করেছে।

কোনো কোনো ধর্মীয় কিতাব মানবজীবন সংক্রান্ত কতিপয় অনাবশ্যক ব্যাখ্যা প্রদান করেছে যা শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকারের গোলযোগ ও জটিলতার কারণে পরিণত হয়েছে। অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থে এমন আছে যে, এগুলো মানুষ ও তার সমস্যাবলী সম্পর্কে কোনো আবেদনই পেশ করে না। সাময়িক চমক সৃষ্টির মাধ্যমে কিছু জটিলতার সৃষ্টি করে মাত্র। প্রথমোক্ত গ্রন্থসমূহ মানুষকে অনাবশ্যক কতকগুলো শিকলে আবদ্ধ করে আর শেষোক্ত গ্রন্থসমূহ মানুষকে বানায় বল্গাহীন।

পক্ষান্তরে কুরআন তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। এ কিতাব একদিকে মৌলিক আক্বিদা বিশ্বাস ও দৃষ্টিভংগীর শিক্ষা দেয়, অপর দিকে আইনকানুন ও 'আল্লাহ্র সীমা ও ক্ষমতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করে; যা লংঘন না করার চূড়ান্ত আদেশ দিয়ে দেয়। আক্বিদা বিশ্বাস, দৃষ্টিভংগীর সীমা ও হদুদ নির্দিষ্ট করে দেয়ার পর মানুষের চিন্তা-গবেষণা ও কর্মের স্বাধীনতা দিয়ে দিয়েছে। মানুষ কুরআনের মেজাজের সংগে খাপ খাইয়ে নিজের কাজ সম্পাদন করবে। এভাবে বুনিয়াদী নীতিমালাকে যথাস্থানে রেখে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সমস্যাবলীর সমাধানের চিন্তা ও কাজের স্বাধীনতা প্রদানকারী একমাত্র গ্রন্থ হলো আল কুরআন, "কোনো ব্যাপারে পরামর্শদাতা হিসেবে নবী (সাঃ)-এর চেয়ে উত্তম ব্যক্তি আমরা আর কাউকে পাইনি" রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাহাবীরা তাঁর দরবারে এ ধারণাই পোষণ করতেন। এই কৃতিত্বও রসূল (সাঃ) কুরআনের বরকতেই অর্জন করতে পেরেছিলেন।

আমরা দেখতে পাই, অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ সাধারণভাবে ক্ষমতাসীন ব্যক্তিবর্গ, জায়গীরদার এবং শক্তিমানদের হাতকেই মজবুত করে থাকে এবং দুর্বলের ওপর অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রেই সহায়ক হয়। পক্ষান্তরে, আল-কুরআন এমন একটি কিতাব যা দুর্বলকে দেয় আশ্রয়, জালিমকে করে পাকড়াও। বলা বাহুল্য, মানব জাতির স্বাধীনতার সনদ বা 'ম্যেগনাকার্টা' হিসেবে আল-কুরআনকে আখ্যায়িত করা যায় দ্বিধাহীন ও উদাত্ত কণ্ঠে।

মানব জাতির 'মেগনাকার্টা'

সাধারণত ধর্মগ্রন্থসমূহ দাবি করে থাকে যে, এসব মানুষকে আল্লাহর সন্নিধানে নিয়ে যায়। কিন্তু কার্যত দেখা যায়, এগুলো মানুষকে বাদশাহ, জায়গীরদার এবং পূজারী পুরোহিতদের কাছে নত করে দেয়। জনগণের ঘাড়কে শক্ত শৃংখলে আবদ্ধ করে বাধ্যানুগত করার কাজ এই গ্রন্থগুলোই আঞ্জাম দিয়ে থাকে। শাসকগোষ্ঠীকে স্রষ্টার অবতার, তাঁর প্রতিনিধি এবং ছায়া ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত করে। কোনো কোনো গ্রন্থে তো শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত মানবস্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে; কিন্তু কার্যত মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে সেগুলো হয়েছে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। অপর পক্ষে আমরা দেখতে পাই যে, আল-কুরআন দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেছে, মানুষ মানুষের গোলামী করতে পারে না। মানুষ মানুষের আনুগত্য করতে পারে না। মানুষের মানুষ-পূজা করা উচিত নয়। মানুষ মানুষের কাছে হাত পাততে পারে না। কুরআন এ শিক্ষাগুলো এমন ঢাকঢোল পিটে ঘোষণা করেছে যে, কুরআনের অনুসারীদের পা থেকে মাথা পর্যন্ত এ খেয়ালগুলো শিরায় শিরায় রক্ত কণিকা হয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এমনিভাবেই আল-কুরআন ইবাদত, দাসত্ব ও আনুগত্য করা এবং সাহায্য চাওয়ার অধিকারী সত্তা হিসেবে একমাত্র আল্লাহ তায়ালার সত্তাকেই নির্ধারিত করে দিয়েছে।

এই শিক্ষাগুলোকে অনুশীলন করলে কি হবে, আর বাস্তবে কি আছে? মানুষের ওপর থেকে মানুষের প্রভুত্ব খতম হলো, মানুষের প্রতি মানুষের জুলুমের দ্বার রুদ্ধ হলো; মুক্ত চিন্তা ও উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টিকারী প্রতিবন্ধকগুলো খান খান হয়ে ধুলিসাৎ হয়ে গেলো। মানুষের আযাদী পূর্ণতা লাভ করলো। সকলে আঁখি মেলে তাকালো, মানবজীবনের সর্বপ্রকার আঁধার বিদুরিত হলো, সত্যের এক বিশাল আলোকস্তম্ভটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো ....।

মানুষের চিন্তার জগতে প্রভাতের হাওয়া প্রবাহিত হতে লাগলো এবং মানুষ খুশীতে তালে তালে অগ্রসর হতে লাগলো। মানুষের ওপর থেকে মানুষের প্রভুত্ব খতম করার তুলনাহীন এই কামিয়াবীর কৃতিত্ব যে কিতাবের তা হচ্ছে কুরআনুল হাকিম। এর চেয়ে বড় মানবাধিকার দলিল মানব জাতি কখনও দেখেনি। 'মেগনাকার্টা' থেকে বড় মহান দলিল যদি কোথাও থেকে

থাকে, তাহলে তা এই কুরআন মজিদ।

এই দলিলের জোরে গোলামেরা তাদের হাতের জিঞ্জির ভেংগে ফেললো। সারা দুনিয়ার মানব জাতিকে একই কাতারে সমঅধিকারের ভিত্তিতে এনে দাঁড় করালো। মানব জাতির মুক্তির এই দলিল, এই আলোক স্তম্ভ, সকল মানুষকে লক্ষ্য করে ঘোষণা দিচ্ছে ঃ

"হে মানুষ! আমি একটি মাত্র নর ও নারী থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছি এবং পুনরায় তোমাদের গোত্র ও ভ্রাতৃত্বে বিভক্ত করে দিয়েছি শুধু মাত্র একে অপরের পরিচয়ের জন্য"। (আল-হুজরাতঃ ১৩)

এই শিক্ষা মানব জাতিকে সুস্পষ্ট বলে দিয়েছে যে, গোটা মানব জাতি একটা স্তম্ভ। একে অপরের পরিচয়ের জন্য শুধু গোত্র, ভ্রাতৃত্ব এবং বংশসমূহের উদ্ভব হয়েছে।

০ জন্মগতভাবে ছোট বড়

০ গোত্রগতভাবে ছোট বড়

০ বংশগতভাবে ছোট বড়

এ সকল পার্থক্যের বীজ ও মূল উৎপাটন করে নিক্ষিপ্ত করা হয়েছে। সকল মানুষই স্বাধীনভাবে জন্ম গ্রহণ করেছে এবং তারা সকলই সম অধিকারের ভিত্তিতে জীবনযাপন করার অধিকারী। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, মানুষকে পরাধীনতা থেকে রেহাই দিয়ে সমঅধিকার দান করে কুরআন কি তাদেরকে বল্গাহীন করলো? তাদেরকে কি বিদ্রোহী বানিয়ে দিল? তাদেরকে কি দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে দিল? না .. না... কক্ষণও না।

আল-কুরআন আল্লাহ্‌ভীতির প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে। একমাত্র আল্লাহ তায়ালাকেই ভয় করে চলো। তাঁরই হুকুম মেনে চলো। অন্য কাউকে ভয় করার প্রয়োজন নেই। এই সমস্ত শিক্ষা প্রদান করে; আল্লাহ্‌র ভয় অন্তরে স্থান দিয়ে শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র আইনের কাছেই মাথা নত করার প্রবল আগ্রহ, কুরআন মানুষকে উপহার দিয়েছে।

অত্যাচারী শাসক, বেইনসাফী আইন, জবর দখলকারী, যুদ্ধ-বিগ্রহ, মৃত্যু, দুঃখ দারিদ্য, মাল ও সম্পদের ক্ষতি — এ সব কিছুর ভয় না করা, ঘাবড়িয়ে

না যাওয়া, বিচলিত ও অস্থির না হওয়ার শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে কুরআন মানুষকে একটি সাহসী, সম্মানিত এবং মর্যাদাশীল জাতিতে পরিণত করেছে। মানুষকে এই বিপুল সম্পদ দ্বারা সমৃদ্ধশালী করার একমাত্র কিতাব হচ্ছে আল-কুরআন। মরুভূমির গলিতে লালিত-পালিত আরব জাতি গোত্রে গোত্রে থাকতো যুদ্ধে লিপ্ত। সমকালীন দুনিয়ার সভ্যতা ও সংস্কৃতির পথও তারা কোনো দিন স্পর্শ করেনি। এই মহান কিতাব এইরূপ একটি জাতিকে ব্যবহার ও সভ্যতায় চৌকস বানিয়ে দুনিয়াভর রাজত্ব করার কৌশল ও বুদ্ধি এবং প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি দিয়ে উপযুক্ত করে সর্বদিক থেকে স্মরণীয় করে রাখলো।

এই বিশাল কার্যক্রম প্রকৃত প্রস্তাবে আল-কুরআনের বিপ্লবী শিক্ষারই ফল। আর এই সত্য কথাটির ঘোষণা হিমালয়ের চূড়ায় আরোহণ করে নিঃসংকোচে ও নির্দ্বিধায় আমি করতে পারি।

এই কিতাবের আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো যে, সর্বাবস্থায় ন্যায় ও ইনসাফের ওপর টিকে থাকা এবং কখনও ইনসাফের চাদর হাতছাড়া না করার জোর তাকিদ প্রতি পদক্ষেপে এ কিতাব দিয়েছে।

হক ও ইনসাফ থেকে বিচ্যুত ব্যক্তিকে আখিরাতে যন্ত্রণাদায়ক আজাবের ভয় দেখানো হয়েছে। নিজের আত্মীয় স্বজনের ব্যাপার হলেও তাদের খাতিরে হক ও ইনসাফের পথ ত্যাগ করোনা, আল-কুরআন এই তাকিদই করে। এর ফলে ইসলামী রাষ্ট্রে হক ও ইনসাফের অতুলনীয় নমুনা ইতিহাসের পাতায় আমরা দেখতে পাই।

মানুষের আযাদী, সাম্য এবং হক ও ইনসাফের এই তিনটি সুন্দর বুনিয়াদী নীতিমালার ওপর কুরআন সমাজবিজ্ঞানের কাঠামো তৈরি করেছে। আল-কুরআনের আর একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের কথা অনুধাবন করুনঃ

অনেক ধর্মীয় গ্রন্থে মানুষের ধর্মীয় জীবন পিতার ধর্মীয় জীবনকেই বলা হয়। এই ধর্মের বিস্তার-বিস্তৃতির ওপরই শিক্ষা-দীক্ষা দেয়া হয়।

অপর দিকে কুরআন বলেঃ মানুষ আল্লাহর উত্তম সৃষ্টি। মানবজীবনের কিছু আবশ্যকীয় ব্যবস্থা সুস্পষ্ট করে দিয়েছে। এই কাজগুলোকে সম্মানের দৃষ্টিতে

দেখে থাকো এবং এই কাজগুলোকে নিজের জীবনে আঞ্জাম দেয়ার জন্য পূর্ণ তাকিদ দিয়েছে এবং বলেছে যে, এই ফরজগুলো আঞ্জাম দিলে কামিল মানুষে পরিণত হওয়া সহজ হবে। জীবন চতুর্গুণ সৌন্দর্য প্রাপ্ত হবে। মানবজীবনকে সম্মানের জীবন এবং সম্মানের দৃষ্টিতে দেখার কিতাব হলো আল-কুরআন।

আল-কুরআন কর্মময় জীবন থেকে পালিয়ে যাওয়ার শিক্ষা দেয় না বরং সে বলে জীবনযুদ্ধের এই মহা সংগ্রামের মধ্যেই প্রকৃত জীবন লাভ করা যায়।

- এই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কিতাব, সত্যিকার অর্থেই আল-কিতাব
- এইরূপ নিয়ামতপূর্ণ কিতাব বাস্তবিকই পবিত্র কিতাব
- এইরূপ শ্রেষ্ঠত্ব সম্বলিত কিতাব নিঃসন্দেহে মহান কিতাব।

নবী অবশ্যই মানুষ

মানুষের মধ্যে সভ্যতা, চরিত্র এবং লজ্জাশীলতা ইত্যাদি সৃষ্টি এবং এগুলোর শিক্ষা দেয়ার জন্য নবী (সাঃ) প্রেরিত হয়েছিলেন। তিনি অত্যন্ত সহজভাবে এ মহান শিক্ষাসমূহ মানুষকে দান করেছিলেন।

অমুক স্রষ্টার অবতার ছিল, অমুক তাঁর অংশ, অমুক তাঁর পুত্র, এসব দাবি নিয়ে যেসব ধর্মের উত্থান ঘটেছিল সেগুলো মানুষ গ্রহণ করে অনুসরণ করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু ইসলামে আমরা দেখি যে, মুহাম্মদ (সাঃ)-কে না আল্লাহ্ বলা হতো, না তাঁর পুত্র, না তাঁর অবতার।

নবী (সাঃ)-কে দেখা যায় একজন সরল সহজ মানুষ হিসেবে। তবে তাঁর জীবনাদর্শ অত্যন্ত পবিত্র। কুরআন ঘোষণা দেয়ঃ হে নবী (সাঃ)! বলে দাও, আমি তো তোমাদেরই মত একজন মানুষ, আমার কাছে অহি আসে যে, তোমাদের রব একজনই। – (আল কাহাফ)

কুরআন মজিদের বিভিন্ন জায়গায় নবীর জবানীতে এ ঘোষণা দেয়া হয়েছে, তিনি যেন বলেন যে, তিনি একজন মানুষ, একজন পবিত্র মানুষ।

- আমি কোনো অলৌকিক ঘটনা দেখাবো না
- আমার নিকট আসমানের সম্পদ মওজুদ নেই।

০ আমি গায়েবও জানিনা

০ আমি তোমাদের মতই মানুষ।

এই দাবির ভিত্তিতে কেউ যদি দীন কায়েম করে থাকেন, তাহলে তো তিনি নবী (সাঃ)। কুরআন স্পষ্ট ভাষায় বলেঃ তুমি মৃতকে শোনাতে পার না, সেই বধিরদের কাছেও তোমার আওয়াজ পৌঁছাতে পারবেনা যারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে ভেগে যাচ্ছে; না অন্ধকে রাস্তা দেখিয়ে পথ ভ্রান্তি থেকে বাঁচাতে পারবে। তুমি তো তোমার কথা শুধু তাদেরকে শোনাতে পারবে, যারা আমার আয়াতের প্রতি ঈমান আনে এবং অনুগত হয়ে যায়। (আন-নমল)

অতএব এ কথা সুস্পষ্ট যে, নবী (সাঃ) কোনো অলৌকিক ঘটনা ঘটাবার চেষ্টা করেননি, আল্লাহ্‌র অংশীদার হবার দাবিও করেননি। সহজ সরল রাস্তা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছিলেন। তিনি একজন ওহিপ্রাপ্ত মানুষ।

কথা শধু এতটুকু নয়। কুরআন বলছে যে, এই পথ থেকে যদি নবী (সাঃ) সরে যান, তবে দুনিয়ার কোনো শক্তি নেই তাঁকে আল্লাহ্‌র আজাব থেকে রক্ষ করতে পারে।

" এবং যদি তুমি তোমার এই জ্ঞান প্রাপ্তির পর যা তোমাকে দেয়া হলো তাদের ইচ্ছার অনুসরণ কর তবে নিশ্চিতভাবে তুমি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।" (আল-বাকারাহ)

যে জ্ঞান তোমার কাছে এসেছে, এর পর যদি তুমি তাদের (বেদীন) ইচ্ছার অনুসরণ কর তবে আল্লাহ্‌র পাকড়াও থেকে রক্ষাকারী কোনো বন্ধু ও সাহায্যকরী তুমি পাবে না। – (আল-বাকারাহ)

যখন আমরা এ কথাগুলো পড়ি, তখন অন্তঃকরণ কেঁপে ওঠে। যাকে মানবতার সর্বোৎকৃষ্ট নমুনা করা হয়েছে তিনি আল্লাহ্‌কে ছেড়ে নিজ ইচ্ছার অনুসরণ করতে পারেন — যাতে তিনি শাস্তিযোগ্য হতে পারেন — না এটা কখনও হতে পারে না। অনন্তর আল-কুরআন স্পষ্ট ভাষায় সতর্ক করছে যে, নবী (সাঃ)-এরও যদি ভুল হয় তাহলে তাঁকে আল্লাহ্‌র পাকড়াও থেকে বাঁচাবার কোনো বন্ধু ও সাহায্যকারী নেই।

কোনো ধর্মগ্রন্থের প্রবর্তনকারীর ওপর এত বড় স্পষ্ট ভাষায় ধমক দেয়া

হয়েছি কি? না, হয়নি।

আমিও একজন মানুষ, তোমরা যেমন মানুষ। আমিও যদি ভুল করি তবে আল্লাহ্র দরবারে পাকড়াও হবো। এই দাবির সাথে কোনো দীন উপস্থাপনাকারী কেউ যদি থাকে তবে তিনি নবী (সাঃ)। কোনো দীন যদি এরূপ পয়গম্বর দিয়ে থাকে, তবে তা দীন ইসলাম।

আবার এর চেয়েও আশ্চর্যজনক কথা আছে, যা আমরা সাধারণত অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের ইতিহাসে পাই না। নবী (সাঃ)-কে তাঁর যুগেও মানুষই মনে করা হতো এবং মৃত্যুর পর আজও মানুষই মনে করা হয় এবং কিয়ামত পর্যন্ত মানুষই মনে করা হবে।

কোনো কোনো ধর্মীয় নেতা মানুষ হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছেন। সারা জীবন মানুষ হিসেবেই পরিচিত ছিলেন, মানবসমাজে সংস্কার ও কল্যাণমূলক কাজ করেছেন। অতঃপর মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। কিন্তু তার চোখ বোজার সাথে সাথে তাঁকে স্রষ্টার মর্যাদায় ভূষিত করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ গৌতম বুদ্ধের কথাই ধরা যাক, তিনি মানুষ হিসেবেই জন্ম গ্রহণ করলেন। হাঁ একথা ঠিক যে, তিনি নেক কাজ করতেন এবং ভালো কাজের দিকে আহবান করতেন। কিন্তু যেই মাত্র মৃত্যুমুখে পতিত হলেন, সংগে সংগে তাঁকে ঈশ্বর বানিয়ে নেয়া হলো। অথচ ইসলামে নবী (সাঃ)-এর সত্তাকে আল্লাহ্র মর্যাদায় অভিষিক্ত করা হয়নি। তিনি মানুষ, সর্বোত্তম চরিত্রের মানুষ এবং পয়গম্বর হিসেবে সমগ্র মানব জাতির কাছে উৎকৃষ্ট নমুনা, সুন্দরতম আদর্শ।

এতটুকু প্রশংসা গুণ-কীর্তন বিগত চৌদ্দশত বছর ধরে চলছে কিন্তু আল্লাহ্র সমতুল্য মর্যাদা তাঁকে কখনও দেয়া হয়নি। উলূহিয়াতের মর্যাদায় তাঁকে অধিষ্ঠিত করা হয়নি।

আন্না দুরাইয়ের দৃষ্টিতে ইসলাম

তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী মিঃ আন্নাদুরাই ১৯৫৭ সালের ৭ই অক্টোবর 'নবী চরিত' বিষয়ের ওপর একটি বক্তৃতা প্রদান করেছিলেন, যেটির উপস্থাপনা এখানে প্রাসঙ্গিক হবে বলে মনে করি। আন্নাদুরাই তাঁর নিজ বক্তৃতায় বলেনঃ

ইসলামের নীতিমালা এবং আইন-কানুনের আবশ্যকতা ষষ্ঠ শতাব্দীতে দুনিয়ার জন্যে যতটুকু ছিল তার চেয়ে অধিক সেগুলোর আবশ্যকতা বর্তমান দুনিয়ার আছে। কারণ বর্তমান দুনিয়া বিভিন্ন সমস্যার সমাধান তালাশ করতে গিয়ে প্রতারণার শিকার হয়েছে। সঠিক সমাধান কোথায়? ইসলাম শুধু একটি ধর্ম মাত্র নয় বরং ইসলাম একটি শাশ্বত জীবনপদ্ধতি বা উত্তম জীবনব্যবস্থা। এই জীবনপদ্ধতি দুনিয়ার বেশ কয়েকটি দেশ গ্রহণ করেছে।

আমার নিজস্ব ধর্মীয় চিন্তা এবং সিরাতুন্নবী (সাঃ) জলসায় আমার অংশ গ্রহণের মধ্যে কোনো বিরোধিতা নেই। ইসলামকে একটি জীবনপদ্ধতি জেনেই আমি জলসায় শরীক হয়েছি।

ইসলামী জীবনপদ্ধতি ও ইসলামী জীবনব্যবস্থার প্রশংসাকারী আমরা কেন হই? এই জন্য যে, মানুষের মন ও মগজে যত সন্দেহ বা আশংকা সৃষ্টি হয় ইসলামী জীবনপদ্ধতি তার জওয়াব সুষ্ঠুভাবে প্রদান করে থাকে। নবী (সাঃ)-এর শিক্ষাসূচির শীর্ষ হলো এই শিক্ষা ঃ

"আল্লাহ্‌র সাথে কারো শরীক করা যাবেনা" এই শিক্ষাকে আমি অন্তর দিয়ে সম্মান করি এবং সুন্দর সুদৃষ্টিতে দেখি।

এই শিক্ষার কদর এত কেন করা হয়? এই জন্য যে, এই শিক্ষা মানুষের চিন্তাশক্তিকে কাজে লাগাতে বাধ্য করে এবং চিন্তা-গবেষণার দিকে মানুষকে প্রবল আগ্রহী করে তোলে। আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করা যায় না। কেন যায় না? আল্লাহ্‌র জাত ও সিফাত কি? মানুষের জন্য এই সকল সমস্যার ওপর চিন্তা করার সমস্ত উপাদান এই শিক্ষাই প্রস্তুত করে দেয়। জনৈক তামিল কবি বলেছেনঃ

"যে দেখেছে সে পায়নি
যে পেয়েছে সে দেখেনি
যে দেখেছে সে বলেনি
যে বলেছে সে দেখেনি"

আল্লাহ্‌র গুণাবলী অসীম। এ গুলোর তালাশ করা এবং ক্রমাগত এদিকে

অগ্রসর হওয়াই পূর্ণতা। আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করার অর্থতো এই হয় যে, কাউকে আমরা তাঁর সমান মনে করি। তাঁর শরীক কে হতে পারে? এ জন্যই নবী (সাঃ) শিরক করতে নিষেধ করেছেন।

অন্যান্য ধর্মে শিরকের অনুমতি দেয়ার কারণে আমরা যেমন বিভিন্ন প্রকার ক্ষতির শিকার হয়েছি; শিরকের রাস্তা বন্ধ করে দিয়ে ইসলাম মানুষকে তেমনি উচ্চ মর্যাদা ও সম্মান দান করেছে এবং নীচুতা ও তার বিপজ্জনক পরিণতি থেকে দিয়েছে মুক্তি। দীন ইসলাম মানুষকে পরিপূর্ণ এবং নেক মানুষে পরিণত করে। আল্লাহ্ তায়ালা যে সুউচ্চ মর্যাদায় পৌঁছানোর জন্য মানুষ সৃষ্টি করেছেন, এই উচ্চ মর্যাদাগুলো পাওয়ার এবং এই স্থানে আরোহন করার শক্তি ও যোগ্যতা মানুষের মধ্যে ইসলামের দ্বারাই সৃষ্টি হতে পারে।

আল্লাহ নিজে প্রকাশ হয়ে 'আমাকে আল্লাহ হিসেবে মানো' এ আদেশ মানুষকে দিতে পারতেন। এমতাবস্থায় মানুষের চিন্তা–গবেষণার দ্বারা কাজ করার সুযোগ থাকতো না। এভাবে মানুষের চিন্তাশক্তির প্রতি আসতো বিরাট আঘাত এবং মানুষ চিন্তা-গবেষণার উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত হয়ে যেতো। পক্ষান্তরে নবী পাঠিয়ে তাঁর মারফৎ যখন আল্লাহ তায়ালা এই খবর দিলেন যে, 'আমার পক্ষ থেকে প্রেরিত রসুল হলো এই'—তখন তা অত্যাবশ্যক হয়ে গেল যে, মানুষ চিন্তা-গবেষণার দ্বারা কাজ করবে।

নবুওতের দাবিদার ব্যক্তিটিকে কি সত্যিই আল্লাহ পাঠিয়েছেন? তাঁর মধ্যে এমন উচুস্তরের গুণাবলী পাওয়া যায় যদ্বারা একজন গুণান্বিত হতে পারে? এই সব কথা চিন্তা করতে মানুষ বাধ্য হয়।

একজন তামিল কবি বলেনঃ

"জ্ঞান ও পরিচিতিই হলো খোদা

খোদাই হলো জ্ঞান পরিচিতি"

প্রকৃত জ্ঞান ও পরিচিত নিশ্চিতভাবে মানুষকে আল্লাহ্র সাথে ওয়াকিফহাল করায়। আল্লাহ্কে যে জানে না এমন হতভাগা মানুষ জ্ঞান ও পরিচিতি থেকেও বঞ্চিত। নিজের জ্ঞান সম্পর্কে তার যত বড় ধারণাই থাকুক না কেন।

ইসলামের আর একটি সৌন্দর্য হলো এই যে, যেই মাত্র তাকে আপন করে নিয়েছে সেই মাত্র জাত, বংশ ভেদ-বিভেদ সব ভুলে গেছে।

মুদগুবুরে তামিলনাড়ুর একটি গ্রাম, যে গ্রামে উঁচু ও নীচ জাতের মধ্যে চলতো ভয়ানক দ্বন্দ্ব। একে অপরের মস্তক মুণ্ডনকারী ব্যক্তিরা যখন ইসলাম কবুল করলো তখন ইসলাম তাদেরকে ভাই ভাই বানিয়ে দিল। সকল প্রকারের ভেদাভেদ খতম করে দিল। নীচু জাতের মানুষ নীচু থাকলো না, বরং সবাই হয়ে গেল সম্মানিত ও মর্যাদাশীল। সকলেই সমঅধিকারের ভিত্তিতে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হলো।

ইসলামের এই সৌন্দর্যে আমি অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছি। বার্ণার্ড শ' যিনি প্রতিটি বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করে পর্যালোচনাকারী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি ইসলামের নীতিমালা পর্যালোচনা করার পর বললেনঃ "দুনিয়ায় অবশিষ্ট এবং স্থায়ী থাকার যদি কোনো ধর্ম থাকে তবে তা একমাত্র ইসলাম।" নবী (সাঃ)-কে কেন মহামানব মানা হয় এবং কেনই বা তাঁর এত প্রশংসা ও গুণকীর্তন করা হয়?

আজ ১৯৫৭ সালে আমরা মানবচেতনা জাগ্রত করার এবং সাধারণ মানুষের আত্মবোধ সৃষ্টি করার কমবেশী চেষ্টা করতে গিয়ে কত ধরনের বিরোধিতার সম্মুখীন হচ্ছি। চৌদ্দশত বছর আগে যখন নবী (সাঃ) আহবান জানালেন যে, মূর্তিগুলোকে আল্লাহ্ মেনোনা। মূর্তিপূজারীদের সামনে দাঁড়িয়ে এই ঘোষণা দিলেন যে, মূর্তিগুলো তোমাদের রব নয়, তাদের সামনে মাথা নত করো না, শুধু এক সৃষ্টিকর্তারই দাসত্ব কর! এই ঘোষণার জন্য কতবড় সাহসের প্রয়োজন ছিল। এই দাওয়াতের কত বড়ই না বিরোধিতা হলো—বিরোধিতার প্লাবনের মধ্যেও পূর্ণ দৃঢ়তার সাথে তিনি এই বিপ্লবী দাওয়াত দিতেই থাকলেন। তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের এটাই হলো একটা বড় প্রমাণ।

এই দৃঢ়তা, যা নবী (সাঃ)-এর ছিল, আজও ইসলাম অনুসারীদের তা আছে। ইসলামী জীবনব্যবস্থা মানুষের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করে দেয়। মানুষের মধ্যে জাগরণ সৃষ্টি করে। মানুষের মাঝে ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসার বন্ধন সৃষ্টি করে। মানুষের মন ও মগজে শুভ বুদ্ধির উদয় ঘটায়।

যখন অন্যান্য ধর্ম মানুষের মধ্যে পক্ষপাতিত্বের উষ্কানী দিচ্ছে, একে অপরকে যুদ্ধে লিপ্ত করাচ্ছে এমনকি পুলিশের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হয়ে পড়ছে, ঠিক এর বিপরীত ইসলামী জীবনপদ্ধতি মহব্বত ও ভালোবাসার বুনিয়াদের ওপর মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে দেয়।

দীন ও সঠিক জীবনপদ্ধতির মধ্যে কোনো পার্থক্য হতে পারে না। পার্থক্য তখন হতে পারে যখন দীনের ধারণা অসম্পূর্ন ও সীমিত হয়, এমনকি যখন এই ধারণা বদ্ধমূল করে নেয়া হয় যে, জীবনের সাধারণ সমস্যাবলীর মধ্যে দীনের কোনো সম্পর্ক নেই।

একটি সত্য দীন, পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থার যদি বাস্তব অনুসরণ করা যায়, তবে তা থেকে মানুষ উপকৃতই হবে, ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। এই জন্য এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা দরকার যেখানে এই জীবনব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে নিজ কার্যক্রম চালু রাখতে পারে এবং যেখানে মানুষকে ন্যায় ও ইনসাফ , সম্মান ও সভ্রম, শান্তি ও নিরাপত্তা দিতে পারে; যা মানুষ একান্তভাবে প্রত্যাশা করে।

পরিবেশ মানুষ তৈরি করে। যেমন পরিবেশ হয় মানুষ সাধারণত সেভাবেই নিজেকে গড়ে তোলে। সাধারণ মানুষের এটা চিন্তা করার অবকাশই নেই যে, পরিবেশ কোনো জীবনব্যবস্থার সুষ্ঠু কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ দেবে কি দেবে না, সে ভেড়ার পালের মত অন্ধভাবে চলতেই থাকে।

বড় মানুষ তো তিনি হতে পারেন যিনি এই পর্যালোচনা করে দেখেন। পরিবেশের গতি ঠিক আছে কিনা, যখন তিনি দেখেন যে, পরিবেশের ধারা উল্টো দিকে চলছে তখন এর বিপরীত দিকে তিনি চলতে থাকেন। তিনি এদিকে মোটেও ভ্রূক্ষেপ করেন না যে, বিপরীত দিকে চললে তাকে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। সত্য ও সঠিক জীবনব্যবস্থার সুষ্ঠু কার্যক্রমের খাতিরে সেই বিপরীত দিকে চলারই দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেন এবং চলতে শুরু করেন। এমনকি শেষ পর্যন্ত কুলষিত পরিবেশকে ভালো পরিবেশের মধ্যে পাল্টিয়ে দেন। শত দুঃখকষ্টের শিকার হওয়া সত্ত্বেও হক পথে চলার আগ্রহ যারা রাখেন প্রকৃতপক্ষে তারাই কাজের মানুষ। এরূপ দৃঢ়চেতা মানুষ যুগের সংগে লড়াই করে এমন এক পরিবেশ নির্মাণ করেন যেখানে সঠিক জীবনপদ্ধতি চালু হতে পারে।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে এরূপ বিশাল ও দৃঢ়চেতা ব্যক্তিত্ব সম্পন্নদের মধ্যে গণ্য করা হয় বরং তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব সাধারণ বড় বড় ব্যক্তিত্বদের চেয়েও অনেক বেশী প্রকাশিত হয়েছে। এমন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির শিক্ষাসমূহ সারা দেশে সাধারণভাবে ছড়িয়ে দেয়া উচিত। এই শিক্ষাসমূহকে সাধারণ্যে ছড়িয়ে দিতে হলে চাই উত্তম পরিবেশ, যার জন্য আবার সুষ্ঠু শিক্ষাব্যবস্থা আবশ্যক, সুষ্ঠুশিক্ষা ব্যবস্থার জন্য আবার আবশ্যক সৎ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা। সৎ সরকার ছাড়া সৎ রাষ্ট্র ব্যবস্থার আমরা চিন্তাও করতে পারি না। এই সৎ সরকার সৎ জনগণের মধ্যেই পাওয়া যেতে পারে। এ থেকে সৎ মানুষের গুরুত্ব এবং তার মর্যাদা ও মূল্য সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। এ প্রকৃতির মানুষই আসলে কোনো সমাজের প্রকৃত পুঁজি যার ওপর সমাজের ভবিষ্যত কাঠামো নির্ভর করে। এর ধ্বংসে মানবতার সবচেয়ে বড় ক্ষতি। দীন ইসলাম হলো হীরক খন্ডের মত। হীরক খন্ড যেমন বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করে, কেউ আংটীতে লাগিয়ে নেয়, কেউ অলংকারাদিতে লাগায়, কেউ বা আবার তা বিক্রি করে বিক্রিত অর্থ আরাম আয়েশে উড়িয়ে দেয়।

হীরার গুরুত্ব ও উপযোগিতা অথবা এর বিনষ্টের ব্যাপার প্রকৃত পক্ষে এটার ওপর নির্ভর করে যে, মানুষ তা কোন্ কাজে লাগাচ্ছে। আমাদের চিন্তা করা উচিত, হীরার চেয়েও মূল্যবান জীবন-ব্যবস্থার সংগে আমরা কি ব্যবহার করছি।

এই দীন কি জালেম ও অত্যাচারীদের সাথে চলতে পারে? এটা কি অসহায় ও দুর্বলের হক মেরে খেতে পারে? অথবা এর বিপরীত নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসতে পারে?

বাস্তব দুনিয়ায় প্রথমোক্ত পরিণতিই সামনে ভেসে আসছে। এমতাবস্থায় আমরা ইসলামের যতই প্রশংসা-স্তুতি করি না কেন, এর কোনোই মূল নেই। হ্যাঁ, যদি শেষোক্ত পরিণতি দেখা যায় তবে নিশ্চিতভাবে মানুষ এ ভরসা করতে পারে যে, এই জীবনব্যবস্থাই সারা দুনিয়ার জন্য রহমতের শিরোপা হবে।

ইসলাম তার সকল সৌন্দর্য এবং আদ্রতা ও উষ্ণতা নিয়ে হীরার ন্যায় আজও মজুত আছে। এখন ইসলামের হিফাজতকারীদের এটা দায়িত্ব যে, তারা

দীন ইসলাম নিষ্ঠার সাথে পালন করবে। এভাবে তারা নিজের প্রভুর সন্তুষ্টি ও রেজামন্দী হাসিল করতে পারে এবং গরীব ও অসহায়দের সকল সমস্যার সমাধানও করতে পারে। ইসলামের অনুসরণ করেই মানব জাতি বস্তুগত ও আত্মিক উন্নয়নের দিকে খুব দ্রুত অগ্রসর হতে পারে।

মনীষীদের দৃষ্টিতে ইসলাম

আমাদের পণ্ডিত ব্যক্তি আল্লামারাই নবী (সাঃ)-কে যে শ্রদ্ধা ও ভক্তির সংগে দেখেন তা আমরা পূর্বেই বর্ণনা করেছি। শুধু আল্লামারাই নয় দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের পণ্ডিত ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরা সবাই নবী (সাঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেছেন। নেপোলিয়ন থেকে নিয়ে এনসাইক্লোপেডিয়া অব বৃটেনিকার সম্পাদকমণ্ডলী পর্যন্ত সবাই নবী (সাঃ)–এর প্রতি এই শ্রদ্ধা ও ভক্তি পোষণ করেছেন।

নেপোলিয়ন বলেন ঃ সেদিন বেশী দূরে নয় যেদিন সকল দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তি একযোগে কুরআনের নীতিমালার ভিত্তিতে একই ধরনের শাসনব্যবস্থা গ্রহণ করে বসবে। কুরআনের শিক্ষা এবং তার নীতিমালা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত মানব জাতির সুখ ও সমৃদ্ধি পরিপুষ্টকারী বিধান। এ জন্য আল্লাহর প্রেরিত রসূল মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর ওপর নাযিলকৃত কিতাব আল-কুরআনের জন্যে আমি গর্ব করি। রসূলে করীম (সাঃ)-এর সমীপে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের ডালি পেশ করি।

গান্ধীজী বলেন ঃ কয়েকবার গভীর মনোযোগের সাথে আমি কুরআন অধ্যয়ণ করেছি, সততা এবং পথ প্রদর্শনের শিক্ষা সেখানে দেখে আমি অত্যন্ত মুগ্ধ ও আনন্দিত হয়েছি।

ডঃ সিমুয়েল জনসন নিজ গ্রন্থ শোহরায়ে আফাক এবং নেচারাল রিলিজিয়ন-এ লিখেছেন ঃ আল-কুরআন না গদ্য না পদ্য। এতে গদ্যের প্রাচুর্য আবার কবিতার ঝংকারও বিধামান। এটা না ইতিহাস, না কোনো জীবনী গ্রন্থ, অথচ উপদেশ ও শিক্ষামূলক কথায় এ হলো সবচেয়ে প্রভাব বিস্তারকারী গ্রন্থ।

হযরত মূসা (আঃ)-কে তৌরাত দেয়া হলো এক সংগে, কিন্তু আল-

কুরআন এক সংগে নাযিল হয়নি, এক সংগে পেশও করা হয়নি। প্লাটোর গ্রন্থে পর্যালোচনা ও গবেষণা পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। কিন্তু আল-কুরআনের নিয়ম ও পদ্ধতি সম্পূর্ণ এর নিজস্ব। এটা এক আহ্বানকারীর কণ্ঠ। জ্ঞান-বিজ্ঞানে ত্বরা, চেষ্টা-সাধনার উদ্দীপনা এবং কর্ম স্পৃহায় ভরপুর একটি গ্রন্থ। নিজ দাওয়াতের বিরোধীদের চ্যালেঞ্জ দানকারী গ্রন্থ, সহানুভূতি ও দরদের সংগে তাদেরকে বোঝাবার গ্রন্থ। এটা এমন একটা বিজ্ঞানময় এবং সামগ্রিক কিতাব যে, সব দেশ ও কালের মানুষকে ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক এর শিক্ষাসমূহ তার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে বাধ্য। এর আওয়াজ অলিতে-গলিতে শোনা যেতে লাগলো, মাঠে-ময়দানে শহরে-বন্দরে শোনা যেতে লাগলো, গ্রামে-গঞ্জে শোনা যেতে লাগলো। স্থান, কাল নির্বিশেষে সকলের ওপর এর ছাপ পড়তে লাগলো।

সর্ব প্রথম এই কিতাব নিজের ওপর লাব্বাইকে ঘোষণা দানকারী আসসাবিকুনাল আউয়ালুনকে উত্তপ্ত ও উদ্দীপ্ত করলো। অতঃপর এদেরকে একটি সংঘবদ্ধ আন্দোলনে জড়িয়ে নিল। এ আন্দোলন ঝড়ের বেগে উৎক্ষিপ্ত হলো। এশিয়া ও ইরানের বিভিন্ন দেশ অতিক্রম করে বহুদূর পর্যন্ত গিয়ে ঠেকলো। যেখানে যেই গঠনমূলক চিন্তার অধিকারী ছিল তাকে এই আন্দোলন আত্মস্থ করে নিল। অন্ধকারে হাতড়িয়ে বেড়ানো ইউরোপীয় খৃষ্টানদের জ্ঞান ও বিজ্ঞাণের প্রশিক্ষণ দিল।

কুরআন শরীফের প্রথম ইংরাজী অনুবাদকারী মিষ্টার রাডবেল নিজ ভূমিকায় আল-কুরআনের প্রশংসায় এই বললেনঃ আরবের জাহেল, অসভ্য ও বর্বর জাতিকে অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে দুনিয়ার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের যোগ্য বানিয়ে ছাড়লো এই কিতাব; যেন কেউ একজন যাদুর কাঠি বুলিয়ে নিল এবং এক বিশাল বিপ্লব আরবের মধ্যে মুহূর্তে, চক্ষুর পলকে এসে পড়লো।

১ লা জানুয়ারী ১৯৪৫ সালে মিসেস সরোজিনী নাইডু কোলকাতার মুসলিম ইন্সিটিটিউটে তার নিজ ধ্যান-ধারণা এ ভাষায় প্রকাশ করলেনঃ কুরআনুল করিম আদব ও ইনসাফের দলিল। স্বাধীনতার চার্টার, ব্যবহারিক জীবনে হক ও ইনসাফের শিক্ষা দানকারী আইনের একখানা বিশাল গ্রন্থ।

অন্য কোনো ধর্মীয় গ্রন্থ আল-কুরআনের মত জীবনের সকল সমস্যার

বাস্তব ব্যাখ্যা ও সমাধান পেশ করতে পারেনি।

জার্মাণ পণ্ডিত গেটে বলেনঃ যখনই আমি আল-কুরআন পড়ি—নতুন নতুন অর্থ সে প্রকাশ করতেই থাকে। এই কিতাবের প্রভাব এর পাঠককে ধীরে ধীরে টেনে নেয় এবং সবশেষে তার মন ও মগজের ওপর বিস্তার লাভ করে।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক গীবন এই ভাষায় এর মহান শিক্ষা পেশ করেছেন ঃ একত্ববাদের ধারণা সুস্পষ্ট ভাষায় প্রকাশকারী এবং অন্তরের কোন্দরে একত্ববাদের নক্শা অংকনকারী মহান কিতাবই হলো কুরআনুন করিম। এনসাইক্লোপেডিয়া অব বৃটেনিকার সংকলক লিখছেনঃ দুনিয়ার সবচেয়ে বেশী পড়া এবং মুখস্ত করা হয় এরূপ গ্রন্থ হলো আল-কুরআন। এ বৈশিষ্ট্য দুনিয়ার অন্য কোনো ধর্মীয় গ্রন্থের নেই।

বেদ-পুরাণে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)

হিন্দুধর্মের বেদসমূহও মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী করেছে। মুহাম্মদ (সাঃ) আরব দেশে ঈসায়ী ষষ্ট শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু এর অনেক আগেই তাঁর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী হিন্দুধর্মের বেদসমূহে করা হয়েছিল। এক বুজুর্গ ব্যক্তির কাছে এ কথা শুনে আমি এর অনুসন্ধান করি। বেদসমূহে হুজুর (সাঃ)-এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে যাই। মহর্ষী দেবেশের ১৮টি পুরাণের একটি পুরাণ হলো ভবিষ্য পুরাণ, তার একটি শ্লোক হলো এইঃ "অন্য একটি দেশে একজন আচার্য তাঁর সংগী সাথী নিয়ে আসবেন—তাঁর নাম হলো মহামদ। তিনি মরু অঞ্চল থেকে আসবেন" (ভবিষ্য পুরাণ, অধ্যায় ৩, সুঃ ৩২৩, ৫ থেকে ৮)

পরিষ্কারভাবে এই শ্লোকে নাম ও স্থানের ইঙ্গিত করা হয়েছে। আগমণকারী বিশাল ব্যক্তিত্বের আরো অনেক চিহ্নসমূহ এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি খৃতনা করা হবেন, জটাধারী হবেন না, তিনি দাড়ি রাখবেন, গোশত ভক্ষণ করবেন। নিজের দাওয়াত স্পষ্ট ভাষায় স্বার্থহীনভাবে পেশ করবেন। নিজ দাওয়াত কবুলকারী ব্যক্তিদেরকে 'মুছলাই' নামে অভিহিত করা হবে (৩য় অধ্যায়, ২৫ নং শ্লোক) এই শ্লোকগুলো গভীরভাবে দেখুন—খতনার

প্রচলন হিন্দুদের মধ্যে ছিলনা, জটা এখানকার ধর্মীয় চিহ্ন ছিল। আগমণকারী মহান ব্যক্তি এই অপরিচিত চিহ্নে চিহ্নিত হলো—আর চিহ্নসমূহ সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো। আবার তাঁর দাওয়াত গ্রহণকারী ব্যক্তিদের মুন্ডলাই বলা হবে—এটা মুসলিম ও মুসলমান শব্দের দিকেই ইঙ্গিত বহন করে।

অথর্ববেদের ২০ অধ্যায়ে আমরা নিম্নলিখিত শ্লোকগুলো পাইঃ "হে ভক্তকুল! গভীর মনোযোগের সহিত শোন! প্রশংসা করা হয়েছে, প্রশংসা হতেই থাকবে, সেই মহামহী মহাঋষী ৬০ হাজার নব্বই জন মানুষের মধ্যে আগমণ করবেন।"

মুহাম্মদ (সাঃ)-এর অর্থ যার প্রশংসা করা হয়েছে। তাঁর জন্মের সময় মক্কার জনসংখ্যা ছিল ষাট হাজার। "তিনি ২০টি নর ও নারী উটকে বাহন বানাবেন। তাঁর প্রশংসা ও স্তুতি স্বর্গ পর্যন্ত চলবে। এই মহাঋষির একশত স্বর্ণালংকার থাকবে।" উটে আরোহণকারী মহা ঋষি আমরা হিন্দুস্তানে পেতে পারিনা —অতএব এটা মুহাম্মদ (সাঃ) আরবীর দিকেই ইঙ্গিত বহণ করছে। একশত স্বর্ণালংকারের অর্থ হাবশায় হিজরতকারী তাঁর একশত প্রাণ উৎসর্গকারী সাহাবী। "দশটি মতির মালা, তিন শত আরবী ঘোড়া, দশ হাজার গাভী তাঁর কাছে থাকবে।" আশরায়ে মুবাশশারা দশজন বেহেস্তের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবাকে দশটি মতির মালার সংগে, বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী ৩১৩ জন সাহাবাকে ৩০০ আরবী ঘোড়ার সংগে তুলনা করা হয়েছে। দশ হাজার গাভী থেকে রসুলকে অনুসরণকারী ব্যক্তিবর্গের আধিক্যের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আল-কুরআন নবী (সাঃ)-কে রাহমাতুল্লীল আলামীন যেভাবে ভূষিত করেছে। ঋকবেদেও বলা হচ্ছেঃ "রহমত উপাধীধারী, প্রশংসিত ব্যক্তি দশ হাজার সাথী নিয়ে আসবেন", ঋকবেদ মন্ত্রঃ ৫, সূত্রঃ ২৮)

এভাবে বেদের মধ্যে মহামহী, মহামদ নামে তাঁর আগমণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

তোমাকে ছাড়া আমরা কাকে পাবো

মুসলমানেরা মুর্খ, জেদী, রাগী, জালিম এবং অহংকারী হয়—এ কথাগুলো সাধারণত অমুসলমান ভাইদের মধ্যে ছড়িয়ে আছে।

যাচাই করলে, নিকটে গিয়ে দেখলে দেখা যাবে সূর্যের চেয়েও বড় একটা বিপরীত চিত্র স্পষ্ট ভেসে উঠবে। ইসলামের অর্থ নিরাপত্তা ও শান্তি। যতদূর আমি জানি, বিনয়, উত্তেজনামুক্ত এবং নিয়ন্ত্রণযুক্ত সহিষ্ণুতার যদি কোনো উৎকৃষ্ট নমুনা থাকে তবে তা মুহাম্মদ (সাঃ)-স্বয়ং।

নেক্‌কার মানুষ, সংস্কারক ব্যক্তি—এরা সকলেই উন্নত চরিত্রের অধিকারী হয়; কিন্তু মানব জাতির ইতিহাসে মুহাম্মদ (সাঃ) যেমন সকল গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিত্ব—তেমন কোথাও পাওয়া যাবে না, এ কথার ঘোষণা আমি আমার মনের মণিকোঠা থেকে দিচ্ছি।

আরবের রাষ্ট্রপতি হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজের কাজ নিজে করতেন। নিজের জুতো নিজেই সেলাই করতেন। নিজের কাপড়ের তালি নিজের হাতেই লাগাতেন। গৃহপালিত পশুদের খাদ্য নিজ হাতেই দিতেন এবং নিজ হাতেই দুগ্ধ দোহন করতেন। দুধপানকারী, দুধের সাগরে অবগাহণকারী রাজা বাদশাদের তো দুনিয়া জানে, কিন্তু দুধদোহনকারী একমাত্র রাষ্ট্রপতি হলেন মুহাম্মদ (সাঃ)।

দাক্ষিণাত্যের একটি ঘটনা আছে। এক ঋষি ভাগীরথি নদীর মাটি বহণ করেছিল। অবশ্য সে মজুরীর জন্যই মাটি বহণ করেছিল। রাজার কানে যখন একথা গেল, তখন যে ব্যক্তি ঋষির মাথায় মাটি উঠিয়েছিল তাকে রাজা শাস্তি দিল।

অপরদিকে আমরা দেখি যে, মদীনার মসজিদ তৈরির সময় তিনিও শ্রমিকদের মধ্যে শরীক ছিলেন—এটা ইতিহাসের কোনো অজানা উদাহরণ নয়।

তাঁর বিছানা ছিল অতি সাধারণ। তিনি চাটাই অথবা চামড়ার ওপর শুয়ে যেতেন এবং কোনো কোনো সময় মাটিতেও শুয়ে আরাম করতেন। তাঁর গৃহ ছিল মাটি দিয়ে তৈরি কাঁচাঘর; খেজুরের পাতা ছিল এর ছাদ। তিনি দুনিয়াত্যাগী কোনো দরবেশ ছিলেন না বরং সমকালীন দুনিয়ায় একজন শক্তিশালী রাষ্ট্রপতি ছিলেন—এরপরও তাঁর এই নিরাবরণ আর এই মৃয়মানতার

কথা চিন্তা করতেই মনে এক আশ্চর্য ভাবের সৃষ্টি হয়।

সব সময় হাসিমুখ।' না গোমড়া মুখ, না রাগত ভাব, না অট্টহাস্যকারী। সকলের জন্যে সাহায্যের হাত সম্প্রসারণকারী মর্যাদাপূর্ণ চালচলনের অধিকারী, কারো সালামের অপেক্ষা না করে আগেভাগেই সালাম দানকারী। বড়দের সম্মানেই শুধু নয় বরং ছোটদেরকেও স্নেহের সালাম প্রদানকারী, কেউ আর্তচিৎকার করতো তো সে নিগৃহীত হোক বা নির্যাতিত, হোক অথবা নিম্নশ্রেণীরই যারা দুনিয়ার মানুষের চোখে ছিল নিকৃষ্ট—তাদের চিৎকারে উদ্দীপ্ত হয়ে দয়ার উৎসাহ ও আগ্রহ নিয়ে 'বান্দা হাজির' বলে দৌড়িয়ে যেতেন। এই হলো মহান, উদার, পবিত্র নবীর প্রিয় আচরণ।

সারাটি জীবনে না তিনি কাউকে ধমক দিয়েছেন, না কাউকে অভিশাপ দিয়েছেন, না কাউকে গালি দিয়েছেন। অনেক বুজুর্গ ব্যক্তির অবস্থা আমরা এও জানি যে, তাঁরা বাইরে অন্যদের সাথে তো বিনয়ী-ধৈর্যশীল হিসেবে দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু নিজ পরিবারে, নিজ চাকরবাকরদের কাছে এবং নিজ অধিনস্তদের মধ্যে অত্যন্ত কঠোর, দাপটওয়ালা এবং রূঢ় ব্যবহারকারী হিসেবে পরিগণিত হয়। কিন্তু নবী (সাঃ)-এর বিনয় ও নম্রতাই ছিল তাঁর ভূষণ। তিনি যেমন অন্যদের সাথে আচরণ করতেন, ঠিক তেমনি নিজ পরিবারের সাথে চাকরবাকরদের সাথে এবং অধিনস্তদের সাথে সদ্ব্যবহার করতেন।

নবী (সাঃ)-এর সাথে মোসাফা করার জন্য কেউ হাত বাড়ালে, তবে তার সাথে হাত মিলিয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলতেন। মোসাফাকারী যতক্ষণ নিজের হাত টেনে না নিতেন ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি তার দিকে হাত বাড়িয়েই রাখতেন। সাথীদের সংগে চলার সময় হাতে হাত মিলিয়ে চলতেন। সবাইকে সম্মান ও মহত্বের সাথে সম্বোধন করতেন। কেউ তাঁর সংগে রুক্ষ স্বরে কথা বললো তিনি ধৈর্যের সাথে তা সহ্য করে যেতেন। অনুপম লাজ-লজ্জার অধিকারী ছিলেন তিনি। শরীফ সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোকদের চেয়েও তিনি ছিলেন লজ্জাশীল।

এরূপ মহান শ্রেষ্ঠ মানুষটিকে যে সমস্ত ভাগ্যবান ব্যক্তি নিজেদের নেতা বানিয়েছে তাদেরই নাম হলো মুসলমান। তাঁর অনুসারীদের মধ্যে আজও এই গুণাবলীর ছাপ দেখা যায়—এই সবই হলো সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর সদকা।

নম্রতাই তাঁর দৃঢ়তা

অনেক ধর্মীয় নেতার জীবনে আমরা এরূপ মুহূর্তও দেখতে পাই যে, তারা আল্লাহ্‌র সাহায্য থেকে নিরাশ হয়েছে বলে মনে হয়—এসব লোক নেককারই বটে; কিন্তু সংকট কালে তাদের মুখ থেকে এমন শব্দ বেড়িয়ে পড়তো যেন আল্লাহ তাদের থেকে বিমুখ হয়েছেন।

এই সম্মানিত ব্যক্তিদের মধ্যে বিনয় তো দেখা যায় কিন্তু এর সাথে সাথে সংকটজনক অবস্থায় নিজ ভিত্তির ওপর দৃঢ়তা ও অটলতা ততটা দেখা যায় না, যতটা এ অবস্থার মধ্যে প্রয়োজন।

নবী আরাবী (সাঃ)-এর অবস্থা দেখুন, তিনি আলোচনা বৈঠকে যতটা নম্র, লড়াই ও জিহাদের ময়দানে আবার ততটাই দৃঢ়। বিপদ ও আপদে পাহাড় সম দৃঢ়তা তাঁর মধ্যে পরিদৃষ্ট হতো।

তাঁর তওহিদের দাওয়াত পেয়ে রাগান্বিত হয়ে একদল লোক তাঁর চাচা আবু তালিবের কাছে ছুটে এলো এবং তাকে ধমকের স্বরে বললো যে, হয় তুমি তোমার ভাতিজাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে এই দাওয়াত থেকে বিরত রাখবে অথবা তুমি আমাদের এবং নবী (সাঃ)-এর মাঝখান থেকে সরে দাঁড়াবে—আমরা স্বয়ং মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বিহিত ব্যবস্থা করে ছাড়বো।

এই সংগীণ অবস্থার পরিপেক্ষিতে আবু তালিব ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন। নবী (সাঃ)-কে ডেকে পাঠালেন এবং তাঁকে কোরাইশদের আকাংক্ষার কথা বলে মহত্ত্বের সংগে এই পরামর্শ দিলেন যে, এমতাবস্থায় তিনি যেন একটু নম্র হন। এই ঘটনার পর সত্য নবী সর্বশ্রেষ্ঠ পথ প্রদর্শকের জওয়াব বিশ্বমানবতার ইতিহাসে একটা অভূতপূর্ব অধ্যায় সৃষ্টি করেছে। তিনি বললেন ঃ যদি এই সমস্ত লোক আমার ডান হাতে সূর্য ও বাম হাতে চন্দ্র এনে দেয়, তবুও আমি আমার প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকবো না। আমার শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত এই দাওয়াত পৌঁছাতে বিন্দুমাত্র অবহেলা করবো না।

বিরোধীরা কতই না যন্ত্রণা তাঁকে দিলেন। নানা ধরণের আবর্জনা তার প্রতি নিক্ষেপ করা হলো। তাঁর প্রতি পাথর বর্ষণ করা হলো, নামাযরত অবস্থায় তাঁর

ওপর উটের নাড়িভুড়ি চাপিয়ে দেয়া হলো; তাঁকে হত্যা করার জন্য প্রতি গোত্র থেকে একেক জন উলঙ্গ তলোয়ার নিয়ে তাঁর গৃহ অবরোধ করলো।

এই সব অসংগত অবস্থায় তাঁর দৃঢ়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পেলো, তাঁর পা বিন্দুমাত্র নড়চড় হলো না। যুদ্ধের ময়দানে তাঁর বিরুদ্ধে হুংকার উঠলো—এ সময়েও নম্র চরিত্রের এই মানুষটি পূর্ণ দৃঢ়তার সাথে সামনে অগ্রসর হলেন, মাত্র ৩১৩ জন প্রাণ উৎসর্গকারী সাহাবা তাঁর সাথে ছিলেন যেখানে বিরোধীদের ছিল কয়েকগুণ বেশী। পূর্ণ সাহসিকতার সংগে তিনি মুকাবিলা করলেন এবং বিজয়ী হলেন।

যুদ্ধের ময়দানে তিনি আহতও হয়েছেন। তাঁর চিবুকে আঘাত লেগেছে, দন্ত মুবারক শহীদ হয়েছে; এক গর্তে তিনি পড়েও গিয়েছিলেন। তথাপি তাঁর সাহসিকতায় ও দৃঢ়তায় বিন্দুমাত্র কমতি আসেনি।

মদীনা অবরোধ হলো; ক্ষুধা, দারিদ্র, দুর্ভিক্ষ নেমে আসলো। এসব অবস্থাতেও নৈরাশ্য তাঁকে সামান্যতম স্পর্শ করতে পারলোনা। সর্বাবস্থায় পূর্ণ আশাবাদী এবং কঠিন থেকে কঠিন অবস্থার মধ্যেও দৃঢ়চিত্তের অধিকারী ছিলেনতিনি।

এই তো হলো মহান নবী (সাঃ)-এর অবস্থা। তাঁর সাহাবীদের অবস্থাও অল্পবিস্তর এরূপই ছিল। এই সম্মানিত ব্যক্তিরা কতই না মজলুম ছিল; তাদের ঠাট্টা করা হয়েছিল, কড়া মারা হয়েছিল, উত্তপ্ত মরুভূমির বালুতে শুইয়ে দেয়া হয়েছিল—এই সব অবস্থায় নবী (সাঃ)-এর এই সাথীরা পূর্ণ শক্তি নিয়ে সত্যের পথে অটল ছিলেন। তওহীদ ও এক আল্লাহর ওপর ভরসা তাঁদের দৃঢ়তার মধ্যে ফুটে উঠতো। এই সাহাবীরা শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত আপন নীতির ওপর অটল থাকতেন। জীবন চলে যেতো, তবুও তাঁরা আপন নীতি থেকে বিচ্যুত হতেন না।

নবী (সাঃ) তাঁর সাথীদের যেমন নম্রতা শিক্ষা দিয়েছেন, ঠিক তেমনি আপন নীতির ওপর অটল থাকার শিক্ষাও দিয়েছেন। বিরোধীদের হাতে তিনি এবং তাঁর সাহাবীরা নির্মম অত্যাচার সহ্য করেছেন অথচ আমরা মক্কা বিজয়ের সময় দেখতে পাই—যখন নবী (সাঃ) তাঁর সাহাবীদের নিয়ে বিজয়ীর বেশে মক্কায় প্রবেশ করছিলেন—তখন তাদেরকে না কোনো বিজয় উল্লাস মাতোয়ারা

করেছিল, না কোনো প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষা তাদের অন্তরে প্রকাশ পাচ্ছিল; বরং এর বিপরীত—দুনিয়া দেখলো যে, তাঁর মস্তক বিণয়াবনত, তাঁর দাড়ি মুবারক উটের কোহান স্পর্শ করছে।

কোরেশরা থরথর করে কাঁপছে। আমরা তাদের প্রতি ভয়ানক অত্যাচার করেছি এখন আমাদের অবস্থা কি হবে?

নবী (সাঃ)-এর দরদ ভরা কণ্ঠ থেকে এ কথাগুলো মুক্তার মত নিঃসারিত হলোঃ "ভায়েরা আমার, আজ তোমাদের কোনো প্রতিশোধ নেয়া হবে না, আল্লাহ তোমাদেরকে মাফ করুন, তিনিই ক্ষমাশীল ও দয়াবান। আজ তোমরা সবাই মুক্ত।" তিনি তাঁর শহীদ চাচার কলিজা কর্তনকারী ও চর্বনকরী উভয়কে মাফ করে দিলেন। মানবতার ইতিহাসে এরূপ কোনো নযির পেশ করতে পারবেন কি? আহা! কত উচ্চ, কত মহান, নবীর এই আচরণ, এই দৃষ্টান্ত।

পাক পবিত্রতা

অনেক সম্মানিত অথচ অজ্ঞ ব্যক্তি ইসলাম ও মুসলমানদের সম্পর্কে কতকগুলো ভ্রান্তধারণা পোষণ করে থাকেন। এটাও একটা তাদের ভ্রান্ত ধারণা যে, মুসলমানদের মধ্যে পবিত্রতার কোনো গুরুত্ব নেই। আমি এই সকল ভাইকে বলবো যে, যদি পবিত্রতার চূড়ান্ত শিক্ষা কোনো ধর্ম দিয়ে থাকে তবে তা ইসলাম। নবী (সাঃ)-এর অনুকরণে যদি প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য পবিত্রতা অর্জন করা যায়, তবে সারা মুসলিম বিশ্ব পবিত্রতার আধারে পরিণত হবে।

ইসলামে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ করা হয়েছে আর পবিত্রতা ছাড়া নামায আদায়ই হয়না। পবিত্রতাকে ইসলামী পরিভাষায় তাহারত বলা হয়। তাহারত তিন প্রকার ঃ

(এক) শরীরের পবিত্রতা

(দুই) পোশাকের পবিত্রতা

(তিন) স্থানের পবিত্রতা।

প্রস্রাব-পায়খানার পর শরীর পাক করার জন্য ইসলাম শিক্ষা দান করে।

প্রস্রাবের পর পাক হওয়ার জন্য ঢিলা কুলুখ ও পানি ব্যবহারের প্রতি জোর, তাকিদ করা হয়েছে। নিম্নলিখিত স্থানে প্রস্রাব-পায়খানা করা নিষেধ করা হয়েছেঃ

বড় রাস্তা, পুকুর ও নদীর ঘাট, ছায়াদার বৃক্ষ, ঈদগাহ, মসজিদ, গোরস্থান এবং জনসমাগমের স্থানসমূহ ইত্যাদিতে। দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা, বদ্ধ পানিতে প্রস্রাব-পায়খানা করা, যানবাহনের ওপর থেকে প্রস্রাব পায়খানা করা নিষেধ করা হয়েছে। এই নিষেধাজ্ঞা শুধুমাত্র পবিত্রতার দিকে লক্ষ্য রেখেই করা হয়েছে। ইসলামে পবিত্রতার গুরুত্ব কত বেশী দেয়া হয়েছে এটা সকলেই অনুমান করতে পারবেন এ থেকেও যে, শুকুর-কুকুর ইত্যাদি নাপাক জন্তুর লালা যদি কোনো তৈজসপত্রে লাগে তবে তা উত্তমরূপে পরিষ্কার করার হুকুম ইসলামে দেয়া হয়েছে। এমনি করে যদি কাপড় অথবা শরীরে রক্ত, কফ, প্রস্রাব- পায়খানা ইত্যাদি লেগে যায় তবে তা উত্তমরূপে ধুইয়ে পবিত্র করে নিতে হয়। এরূপে দুগ্ধপোষ্য শিশু যদি প্রস্রাব করে দেয় তাহলে শরীর ও কাপড় ধৌত করা আবশ্যকীয় হয়ে যায়।

নামাযের শর্তসমূহের মধ্যে এ কথা জুড়ে দেয়া হয়েছে যে, নামাযের স্থান, কাপড় ও শরীর পাক হতে হবে। নামাযীর জন্য এটা জরুরী যে, নামাযের আগে অযু করতে হয়। যদি গোসলের দরকার হয় তবে গোসল করা ওয়াজিব। গোসলের সময় প্রথমে কুলি ও গড়গড়া করতে হয়, নাকে পানি দিয়ে তা উত্তমরূপে পরিষ্কার করতে হয়। অতঃপর সমস্ত শরীরে পানি ঢেলে গোসল করে নিতে হয়।

অযুর সময়ও কুলি করতে হয়, নাকে পানি দিয়ে তা পরিষ্কার করতে হয়, মুখমণ্ডল ও পা ধৌত করতে হয় এবং এ সকল কাজ তিনবার করে করতে হয়। ভেজা হাতে মাথা ঘাড় এবং কান মোসেহ করতে হয়। এ পর্যায়ে মেসওয়াকের ওপর জোর তাকিদ দেয়া হয়েছে এবং এর বিরাট ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রতিদিন নামাযের জন্য পাঁচবার অযু করতে হয়। এখন আপনারা নিজেই বুঝতে পারেন যে, ইসলামে পবিত্রতার গুরুত্ব কতখানি দেয়া হয়েছে।

নবী (সাঃ) স্বয়ং পবিত্রতার গুরুত্ব খুব বেশী দিতেন। দাঁত পরিষ্কার করার

জন্য তাঁর মেসওয়াক সর্বদাই বালিশের নীচে থাকতো। যে কোনো জায়গায় থুথু ফেলা মোটেই পছন্দ করতেন না। যদি কেউ থুথু ফেলা ঠিক নয় এমন জায়গায় থুথু ফেলতেন তবে নিজে এগিয়ে গিয়ে তা পরিষ্কার করে দিতেন। তিনি তাঁর অবস্থান গৃহ আয়নার মত পরিষ্কার রাখতেন। তাঁর পোশাক ছিল সাদা এবং সাধারণ, কিন্তু পাক-পবিত্র, পবিত্রতা ইমানের অংশ এটা নবী (সাঃ)-এর ফরমান।

ইসলামে নারীর মর্যাদা

ইসলাম ও মুসলমানদের ব্যাপারে যেসব ভ্রান্তি পাওয়া যায়, তার মধ্যে কিছু বিভ্রান্তি নারী জাতি সম্পর্কিত।

ইসলামের আগে সাধারণত প্রতিটি সমাজ ও সোসাইটিতে নারী জাতিকে নিকৃষ্ট মনে করা হতো।

- ভারতীয় সমাজে স্বামীর মৃত্যুর পর তার লাশের সাথে স্ত্রীকে চিতায় জীবন্ত দগ্ধীভূত হতে হতো।
- চীনে নারীর পায়ে লৌহের সংকীর্ণ জুতো পরিয়ে দেয়া হতো।
- আরবে মেয়েদের জীবন্ত কবর দেয়া হতো।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, নিকটবর্তী যুগে এই জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকারী সংস্কারকের আবির্ভাব তো হয়েছে, কিন্তু এই সকল সংস্কারকের শত শত বছর আগে আরব ভূখণ্ডে নবী (সাঃ) এই নির্যাতিত নারীদের মহান দরদী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং অক্টোপাসের মত জড়িয়ে ধরা জুলুমের অবসান ঘটিয়ে দিয়েছিলেন।

নারী অধিকারে অজ্ঞ আরব-সমাজে হুজুর (সাঃ) নারীদেরকে পুরুষের সমান অধিকার দান করলেন। সম্পত্তির মধ্যে নারীদের কোনো অধিকার ছিল না। তিনি উত্তরাধিকারীর মধ্যে তাদের হক নির্দ্ধারণ করে দিলেন। নারী অধিকার সুস্পষ্ট করার জন্য আল-কুরআনে আদেশ ও ফরমান নাযিল হলো। পিতামাতা ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের সম্পত্তিতে নারীদেরকে ওয়ারিশ

ঘোষণা করা হলো।

আজ উচ্চ কণ্ঠে সভ্যতার দাবিদার কিছু দেশে নারীদের অধিকার না সম্পত্তিতে রাখা হয়েছে, না ভোটে রাখা হয়েছে। ১৯২৮ সালে ইংল্যাণ্ডে সর্বপ্রথম নারীদের সম্পত্তিতে অধিকার দেয়া হয়। ভারতীয় সমাজে নারীদের সম্পত্তিতে অধিকার এইতো পরশু দেয়া হলো। অথচ আমরা দেখি যে, আজ থেকে চৌদ্দশ' বছর আগে নবী (সাঃ) এই সমস্ত অধিকার নারীদের প্রদান করেছেন। কতই বড় মহৎ ও দরদী তিনি।

নবী (সাঃ)-এর শিক্ষাসমূহের মধ্যে নারীদের অধিকারের ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। তিনি তাকিদ করেছেন যে, মানুষ এই ফরজ কাজে যাতে গাফেল না হয় এবং ইনসাফের সাথে নারীদের অধিকার আদায় করতে সচেষ্ট হয়। তিনি উপদেশ দিয়েছেন, নারীদেরকে মারপিট করা যাবে না। নারীর সংগে কিরূপ ব্যবহার করতে হবে এ সম্পর্কে তাঁর এরশাদগুলো দেখুন ঃ

(এক) নিজের স্ত্রীকে প্রহারকারী সুচরিত্রের অধিকারী নয়।

(দুই) তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম ব্যক্তি যে নিজের স্ত্রীর সংগে ভালোব্যবহার করে।

(তিন) নারীদের সংগে ভালোব্যবহার করার আদেশ আল্লাহ তায়ালা আমাদের দিয়েছেন, কেননা এরা আমাদের মা, বোন এবং কন্যা।

(চার) মায়ের পায়ের নীচে বেহেশত।

(পাঁচ) কোনো মুসলমান নিজ স্ত্রীকে যেন ঘৃণা না করে। যদি তার কোনো অভ্যাস খারাপ হয় তবে তার অন্য ভালো অভ্যাস দেখে যেন সে খুশী হয়।

(ছয়) নিজের স্ত্রীর সংগে চাকরানীর মত ব্যবহার করো না, তাকে মেরো না।

(সাত) যখন তুমি খাবে তখন তোমার স্ত্রীকেও খাওয়াবে, যখন তুমি পরবে তখন তোমার স্ত্রীকেও পরাবে।

(আট) স্ত্রীর ওপর দোষ চাপাইও না, তার চেহারায় মেরোনা, তার মনে

ব্যথা দিওনা, তাকে ছেড়ে চলে যেয়ো না।

(নয়) স্ত্রী নিজ স্বামীর স্থলে সকল অধিকারের অধিকারিনী রাণী।

(দশ) নিজ স্ত্রীদের সংগে যারা ভালো ব্যবহার করবে তারাই তোমাদের মধ্যে উত্তম।

এতকিছু অধিকার দেয়ার পর নারীকে আবার স্বাধীন করে দেয়া হয়নি। বরং তাকে কিছু সীমার আওতাভুক্ত করে দেয়া হয়েছে।

(এক) যখন স্বামীকে দেখবে, খুশী হয়ে যাবে। আদেশ করলে, পালন করবে। স্বামী যদি দূরদেশে থাকে তবে তার সম্পদের এবং নিজ সতীত্বের হিফাজত করবে। এই রূপ নারীকে উপযুক্ত স্ত্রী মনে করা হয়।

(দুই) সুচরিত্রবতী স্ত্রী পাওয়া একটি অতুলনীয় সম্পদ ।

(তিন) যে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে, রমযানে রোজা রাখে এবং নিজের স্বামীর আনুগত্য করে, নিজের সতীত্বের হিফাজত করে—এই প্রকার মহিলা যে রাস্তায় সে চায় জান্নাতে প্রবেশ করবে।

(চার) দুনিয়ার সকল সম্পদের চেয়ে বড় মূল্যবান সম্পদ হলো পরহেজগার স্ত্রী।

এভাবে তিনি নারীদের অধিকারও দিয়েছেন আবার তাদের দায়িত্বও বলে দিয়েছেন।

প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এতকিছু অধিকার নারীদেরকে দেয়া পর ইসলাম কেন একাধিক বিয়ের অনুমতি দিল? এটা কি নারীদের ওপর বড় জুলুম নয়?

এ পর্যায়ে আমাদেরকে ইতিহাস, পুরুষের স্বভাব, জীবনের সমস্যাসমূহকে দৃষ্টিকোণে নিয়ে আসতে হবে।

ভারতে রাজা দশরথের কয়েকজন স্ত্রী ছিল। এই ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে আমরা রামরুণী, সত্যবাঈ এবং রাধা ছাড়াও অসংখ্য অভিসারিণী গোপিনীর মাঝে দেখতে পাই। বেহায়া মেয়েদের সাথে মৃণালের মত দেবতাকেও ফুর্তি করতে দেখা যায়—এগুলো তো পুরানো যুগের পুরানো কাহিনী। এখন ঐতিহাসিক ঘটনাবলী দেখুন, বড় বড় রাজাদের কাছে একাধিক স্ত্রী থাকতো।

তামিলনাড়ুর কাটা ব্রাহ্মণের ঘরে কয়েকজন স্ত্রী ছিল। আজও অনেক রাজনৈতিক নেতা কয়েকজন স্ত্রী রাখছেন।

ইসলাম পূর্বকালে আরবদেশে স্ত্রীদের সংখ্যার ওপর কোনো সীমা-পরিসীমা ছিল না। নবী (সাঃ) পুরুষের জৈবিক চাহিদা এবং সাংসারিক চাহিদার ভিত্তিতে ওপরোক্ত সীমাহীন সংখ্যাকে চারজনের সীমায় আবদ্ধ করে দেন।

ইসলাম পূর্বকালে আরববিশ্বে বিয়ের কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম ছিলনা। দলের পর দল স্ত্রী ও বাঁদী রাখা একটা সাধারণ নিয়ম ছিল। এমনি করে তালাকেরও ছিলনা কোনো নিয়ম ও শৃংখলা। যখন যে ইচ্ছা করতো, তালাক দিয়ে দিত। এই অবস্থাগুলোর পরিবর্তন ও সংস্কারের জন্য আসলো আল্লাহ তায়ালার আহকাম। সীমিত সংখ্যার মধ্যে বিয়ের অনুমতি দেয়া হলো। আবার তালাকের ক্ষেত্রেও সুষ্ঠু পথ ও পদ্ধতি অনুসরণের হুকুম দেয়া হলো। কুরআনে এরশাদ হলো : তোমরা যদি আশংকা কর যে, এতিম বাচ্চাদের পালন করা বিয়ে ছাড়া সম্ভব নয় তবে নিজের পছন্দমত দুই, তিন অথবা চার পর্যন্ত মেয়েকে বিয়ে করতে পার। (এ আশংকা যদি হয় যে, এদের সাথে ইনসাফ করতে পারবে না) তবে একজন মেয়ে অথবা একজন দাসীই যথেষ্ট, বেইনসাফী থেকে বাঁচার জন্য এই হলো সহজ পদ্ধতি।

এই হেদায়াতের মধ্যে যে গূঢ় রহস্য নিহিত আছে তা চিন্তা করুন : ন্যায়, ইনসাফ ও সততার সাথে বিবাহিত স্ত্রীদের নিয়ে বসবাস করা। একাধিক স্ত্রীর অনুমতিও আছে আবার তার সাথে সাথে বেইনসাফী থেকে বেঁচে থাকারও তাকিদ করা হয়েছে। ইনসাফ করা সম্ভব না হলে এক স্ত্রীর প্রতিই সন্তুষ্ট থাকার তাকিদ দেয়া হয়েছে।

পুরুষের যে কোনো সময় তার জৈবিক পিপাসা মেটাবার প্রয়োজন হতে পারে। কারণ প্রকৃতিই তাকে সর্বকালীন জৈবিক চাহিদা পূরনের উপযুক্ত করেছে—অথচ নারীর ক্ষেত্রে অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্নতর।

মাসিক ঋতুকালীন সময়, গর্ভাবস্থায় (৯/১০ মাস), প্রসবের পর আরো কয়েক মাস স্ত্রী স্বামীর সহবাসের উপযুক্ত থাকে না।

সকল পুরুষের ক্ষেত্রে এ কথা আশা করা যায় না যে, সে নিয়ন্ত্রণ ও ধৈর্যের সাথে থাকবে এবং যতক্ষণ তার স্ত্রী সহবাসের উপযুক্ত হবে না ততক্ষণ তার কাছে আসবেনা—সে নিজকে জৈবিক কর্ম থেকে বিরত রাখবে। পুরুষ বৈধ পথে নিজ জৈবিক অভাব পূরণ করতে পারে এরূপ আবশ্যকীয় রাস্তা খুলে রাখা দরকার এবং এরূপ সংকীর্ণ করা ঠিক নয় যার ফলে সে হারাম রাস্তায় পা বাড়াতে বাধ্য হয়। স্ত্রী তো একজন ঠিক আছে, কিন্তু উপপত্নী বেহিসাব। এতে সমাজ যেভাবে ক্লেদাক্ত হবে, চরিত্র ও কর্মকাণ্ড যেভাবে বরবাদ হবে তা অনুমান করতে আপনাদের বিন্দুমাত্র অসুবিধা হবে না।

জ্বেনা-ব্যাভিচারকে হারাম ঘোষণা দিয়ে একাধিক স্ত্রী রাখার অনুমতি দানকারী বিজ্ঞজনোচিত দীন হলো ইসলাম। সীমা নির্দ্ধারণ করে একদিক বিবাহের অনুমতি দিয়ে ইসলাম প্রকারান্তরে নারী ও পুরুষের শারীরিক যোগ্যতা, তাদের রীপুর তাড়ন, সাংসারিক আবশ্যকতার দিকে লক্ষ্য দেয়ার ব্যবস্থা করেছে। এমনিভাবে আমাদের দৃষ্টিতে ইসলাম একটি বিজ্ঞানসম্মত জীবনাদর্শে পরিণত হয়েছে।

তলোয়ারে নয় উদারতায়

ইসলাম তলোয়ারের জোরে প্রসারিত হয়েছে একথা বলা নিছক একটা ভ্রান্ত দাবি এবং ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত। আসুন,এ ব্যাপারে পর্যালোচনা করে প্রকৃত সত্যের উদঘাটন এবং সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাবার চেষ্টা করি। ঈসায়ী ধর্ম ও ইসলাম স্ব স্ব প্রাথমিক স্তরে নিরব প্রচারের মাধ্যমে প্রসারিত হয়েছে। ঈসায়ী ধর্মের প্রচার হযরত ঈসা (আঃ)-এর পরে তাঁর হাওয়ারীরা করেছিল। কিন্তু ইসলামের প্রচার কিছুদিন চুপে চুপে চলছিল অতঃপর প্রকাশ্যভাবে এর দাওয়াত দেয়ার হুকুম আসলো।

ইসলামে জোর জবরদস্তি নেই সুস্পষ্টভাবে এর ঘোষণা দেয়া হলো—একারণেই বলা হচ্ছে,"দীনের ব্যাপারে কোনো জোর জবরদস্তি নেই।" কোনো ব্যক্তি বলতে পারে যে, যদি তাই হয় তবে নবী (সাঃ) কেন যুদ্ধ করলেন, তাঁকে তলোয়ার কেন উত্তোলন করতে হলো? বাস্তব অবস্থা হলো, তিনি যে-

সমস্ত যুদ্ধ করেছেন এগুলোকে আক্রমণাত্মক যুদ্ধ বলা যেতে পারে না। তাঁর যুদ্ধসমূহ আক্রমণাত্ম নয় বরং প্রতিরোধক যুদ্ধ ছিল। মক্কাবাসীরা মদীনার ইসলামী রাষ্ট্র খতম করার বাসনায় বের হয়েছিল। এই মদীনা সেই মদীনা যেখানে নবী (সাঃ) আশ্রয় পেয়েছিলেন। ইসলামী রাষ্ট্র খতম করার জন্য কুরাইশরা আক্রমণাত্মক পদক্ষেপ নিল তাই তাদের সংগে যুদ্ধ করতে বাধ্য হতে হলো। ইতিহাসের পরবর্তী যুগে মুসলমান রাজা-বাদশারা যে সমস্ত যুদ্ধ করেছেন সেগুলোর সংগে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই।

হিন্দু রাজা রাজেন্দ্র জাভা ও সুমাত্রায় সামরিক অভিযান চালিয়েছিল। সেখানে এখনও হিন্দু সভ্যতা বিরাজমান, কিন্তু এ থেকে এই সিদ্ধান্ত নেয়া ঠিক হবে না যে, রাজা রাজেন্দ্র হিন্দুধর্ম প্রচারের জন্য সামরিক অভিযান চালিয়েছিল।

ইউরোপের খৃষ্টানরা সামরিক অভিযান চালিয়েছিল এবং প্রাচ্যের দেশসমূহে নিজেদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। এই সাম্রাজ্যে ঈসায়ী ধর্ম প্রসার লাভ করেছিল। কিন্তু আপনারা কি বলতে পারেন এই সমস্ত দেশে খৃষ্টবাদ তলোয়ারের জোরে প্রসারিত হয়েছে? সামরিক অভিযান তো সাধারণত সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য হয় এবং যে দেশে যাদের রাজ্য কায়েম হয় সেই শাসকগোষ্ঠীর অনুকরণে সে দেশের সাধারণ মানুষ গড়ে ওঠে এবং তাদের ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে। হিন্দুদের মধ্যে একটা ধর্মীয় শাখা ছিল সেমিনর, যখন এই শাখার লোকেরা তামিলনাড়ুতে রাজ্য বিস্তার করলো তখন সেমিনর মতবাদ এখানে বিস্তার লাভ করলো। হিন্দুস্তানে যখন বৌদ্ধরা শাসক হলো তখন বৌদ্ধ ধর্ম বিস্তার লাভ করলো। এমনিভাবে শিউমুর ধর্মাবলম্বী হিন্দুরা যখন শাসক হয়ে আসলো, তখন এই মতবাদ সাধারণ্যে বিস্তার লাভ করলো এবং যখন বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী লোকেরা শাসক হলো তখন এই মতবাদ আবার সাধারণ মানুষের মতবাদে পরিণত হলো। এ থেকে এই বোঝা যায় যে, যেমন রাজা তেমন প্রজা এই ছিল আসল ব্যাপার। নতুবা ধর্ম বিস্তারে এই শাসকদের না কোনো আকর্ষণ ছিল, না একারণে তারা করেছিল যুদ্ধ।

ইতিহাসে এমন কোনো ঘটনা পাওয়া যাবেনা যে, যদি কেউ ইসলাম কবুল করতে অস্বীকার করেছে তো তাকে ইসলাম কবুল না করার অপরাধে

হত্যা করা হয়েছে।

অথচ ক্যাথলিক ও প্রোটেসটাইনদের বিরোধে ধর্মীয় মূলনীতির ব্যাপারে হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ সংঘটিত হয়েছিল। দূরে কেন যাবো, তামিলনাড়ুর ইতিহাসে দেখি, মাদ্রাজে জ্ঞানসমুদ্রের যুগে আট হাজার সেমিনর ধর্মাবলম্বীকে শূলে চড়ানো হয়েছিল, এই হলো আমাদের ইতিহাস।

আরবে নবী (সাঃ) রাষ্ট্রপতি ছিলেন, সেখানে ইহুদীও ছিল, খৃষ্টানও ছিল, কিন্তু তাদের সংগে কোনো বিরোধ লাগানো হয়নি।

হিন্দুস্তানে মুসলমান বাদশাহ্দের যুগে হিন্দুধর্ম পালনকারীদের ধর্মপালনের পূর্ণ অনুমতি ছিল। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, বাদশাহ্রা মন্দিরের হিফাজত করেছেন, তত্ত্বাবধান করেছেন।

মুসলিম সামরিক অভিযান যদি ইসলাম প্রচারের জন্য হতো তাহলে দিল্লীর মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে বাবর কখনও সামরিক অভিযান চালাতেন না। রাজ্য দখলই সে যুগে মুসলমানদের রাজনৈতিক পলিসি ছিল। রাজ্য বিস্তারের সংগে ধর্ম প্রচারের কোনো সম্পর্ক ছিল না। অনেক মুসলমান আলেম ও সূফী ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে হিন্দুস্তানে এসেছেন এবং তাঁরা নিজস্ব তরিকায় এখানে ইসলাম প্রচারের কাজ সম্পাদন করেছেন। মুসলমান শাসকদের সংগে তাদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। নাগরে সমাহিত হযরত শাহ আল হামিদ এবং আজমীরে সমাহিত হযরত মঈনুদ্দীন চিশতী (রঃ) প্রমুখ হলেন এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

ইসলাম এর নিজস্ব নীতিমালা এবং নিজস্ব চরিত্র মাধুর্য দ্বারা একটি অসীম আকর্ষণ রাখে, আর এটাই কারণ যে, মানুষের অন্তঃকরণসমূহ আপনা আপনিই এদিকে চলে আসে। অনন্তর ইসলাম এমনি একটি দীন, এর প্রচারের জন্য তরবারি উত্তোলনের কোনে প্রয়োজন আছে কি?

কমিউনিজমের চেয়ে ইসলাম শ্রেষ্ঠ

পুজিবাদের মেরুদণ্ডে প্রচণ্ড আঘাত প্রদানকারী মতবাদ দুটো হলো : কমিউনিজম এবং ইসলাম। ভারতের কমিউনিস্টদের মধ্যে অল্প কিছু ব্যক্তি দাসকেপিট্যাল গভীর অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ণ করেছেন। মার্ক্স-এর একটি থিউরি যার নাম হলো Serplus value (অতিরিক্ত মূল্য)। এই থিউরিটি ব্যাখ্যা করতে মার্ক্স এর গ্রন্থ তিনটি বড় খণ্ডে লিখিত হয়েছে।

কমিউনিজমের দাবি হলো যে, পুজিপতি পুজি খাটায়, শ্রমিক এই পুজিতে শ্রম দিয়ে লাভ সৃষ্টি করে। এই লাভ আসল পুজি থেকে অতিরিক্ত; এই অতিরিক্ত আমদানি দিয়ে পুজিপতি আরো একটি কারখানার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে এবং সাধারণ মানুষকে শোষণ করে। এই দাবির পরিপ্রেক্ষিতে কমিউনিজম সামনে অগ্রসর হয় এবং পুজিবাদের আসল শক্তি এই অতিরিক্ত মূল্য খতম করার- জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়। সে পুজিবাদকে মিটিয়ে দিয়ে উৎপাদনের সকল উপকরণ জাতীয়করণ করে ফেলে।

চিন্তার বিষয় যে, কারখানাগুলো জাতীয়করণ করলেই কি সমস্যার সমাধান হতে পারে? জাতীয়করণকৃত কারখানাগুলোতেও অতিরিক্ত মূল্য অথবা লাভ আসবে। প্রশ্ন হলো, এই লাভ কোথায় নেয়া হবে এবং এটাও দেখতে হবে যে, বাস্তবে এই লাভ কি হচ্ছে? কোনো কারখানার লভ্যাংশে শুধু সেখানকার কর্মরত শ্রমিকরাই অংশ পেয়ে থাকে। অন্য কারখানার শ্রমিক বা দেশের দরিদ্র জনসাধারণ সেখানে কোনো অংশ পায় না। জাতীয়করণের উদ্দেশ্য এটা হওয়া উচিত ছিলনা। লাভ গোটা জাতির মধ্যে বন্টিত হওয়া উচিত।

কমিউনিস্ট রাষ্ট্র আইনের জোরে লাভ কেড়ে নিয়ে অন্যকে দিয়ে দেয়। এর বিপরীত ইসলাম অতিরিক্ত মূল্যকে অন্যের নিকট খরচ করার জন্য উৎসাহিত করে; তাকিদ দেয়। এ কাজের পেছনে রাষ্ট্রীয় শক্তি কাজ করে না বরং বিশ্বাসের শক্তিই এখানে কার্যকর।

কমিউনিস্ট দেশে কারখানাগুলোকেই শুধু জাতীয়করণ করা হয়। লভ্যাংশের বন্টন ব্যবস্থা যা কিছু হয়, তাদের মধ্যেই হয়। এখন থাকলো ঐ

সমস্ত সম্পদ যা ব্যক্তির কব্জায় থাকে, এখান থেকে প্রাপ্ত লাভ বন্টনের কোনো ধারণাই নেই এবং বাস্তবক্ষেত্রে এর কোনো ব্যবস্থাও নেই। অথচ ইসলাম ব্যক্তিগত সম্পদ থেকে উৎপাদিত অতিরিক্ত মূল্য অন্যদের জন্য খরচ করার তাকিদ প্রদান করেছে। অতিরিক্ত মূল্যের একটি অংশ জনকল্যাণের জন্য বের করে খরচ করাকে 'জাকাত' নাম দেয়া হয়েছে। আরবী ভাষায় জাকাত অর্থ পাক ও পবিত্র। নিজস্ব উৎপাদন থেকে একটা অংশ বের করা হলো জাকাত। এই জাকাত বের করে মানুষ যেন তার সম্পদকে পাক করে ফেলে। যদি এটা না করে তবে সমস্ত সম্পদ নাপাক হয়ে যায়। এই উন্নত শিক্ষা দুনিয়ায় দিয়েছে একমাত্র ইসলাম। এখানে কেউ এই আপত্তি করতে পারে যে, নিজ সম্পদ থেকে জনকল্যাণমূলক কাজে খরচ করার শিক্ষা দেয়া তো ধর্মের একটা সুপারিস; কোনো ধনশালী যদি ধোকা দিতে চায়, এমনকি ধোকা দিয়েই ফেলে তবে তাকে এ থেকে কে বিরত রাখবে?

এই আপত্তির জওয়াব আমরা ইতিহাসে পেয়ে থাকি। জাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রাঃ) তলোয়ার ধারণ করেছিল। অথচ এই জাকাত অস্বীকারকারীরা আপাত দৃষ্টিতে মুসলমান এবং ইসলামের অনুসারী ছিলেন। দীন ইসলাম পালনকারী, নবী (সাঃ)-এর ওপর ঈমান পোষণকারী নামায আদায়কারীদের বিরুদ্ধে এই তলোয়ার উত্তোলিত হয়েছিল। যে অপরাধে তারা অপরাধী হয়েছিলেন, তা ছিল এক ভয়ংকর অপরাধ। আল্লাহর ওপর ঈমান আনার পর যে বিষয়ের ওপর ইসলাম সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে, তা হলো জাকাত। অর্থাৎ নিজ সম্পদের একটা অংশ বের করে নিজের অক্ষম ভাইকে সাহায্য করা।

এখানে একথা মনে রাখা দরকার যে, ব্যক্তি তার মূল সম্পদ ও মূল পুজি থেকে অন্যের জন্য খরচ করবে। এই শিক্ষা কমিউনিজম দেয় না। কিন্তু ইসলাম এ ক্ষেত্রে শক্ত তাকিদ করছে যে, আবশ্যিকভাবে এ খরচ করতে হবে। কেউ যদি এ খরচ না করে ইসলাম তার বিরুদ্ধে তলোয়ার ধারণ করবে যদিও সে মুসলমান হয়।

সাধারণত পুজিপতিদের মনে এ ধারণা বিরাজ করে যে, তার সম্পদ তার আরাম আয়েশের জন্যই; এ সম্পদ অন্যের জন্য খরচ করলে নিজের দারিদ্র্যই

ডেকে আনা হবে। এ আশংকাই সাধারণত মানুষকে বিচলিত করে তোলে। ইসলাম সবার আগে এ আশংকা নির্মূল করে দেয়। আল-কুরআন প্রকাশ্যভাবে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করে " খরচ করলে দারিদ্র্য নয় বরং স্বচ্ছলতা আসে।"

"শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্র্যের ভয় দেখায়, এবং লজ্জাকর কৃপণতার দিকে উৎসাহ প্রদান করে। কিন্তু আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা ও অনুগ্রহের আশা প্রদান করে। আল্লাহ তায়ালা বিশাল ভাণ্ডারের অধিকারী ও সর্বজ্ঞানী।"

কার্পণ্য কি? নিজ প্রয়োজন, পরিবার-পরিজনের প্রয়োজন, অন্যান্য মানুষের প্রয়োজনে খরচ না করে সম্পদ স্তরে স্তরে সাজিয়ে রাখাই কার্পণ্য। তামিল ফিল্মজগতে একজন বড় গায়ক ছিল। সে ছিল বড় কৃপণ। তার ছেলের পায়ে জখম হলো, এর চিকিৎসার জন্য পয়সা খরচ করতে সে বিব্রত বোধ করলো। ফল দাঁড়ালো যে, তার ছেলে মারা গেল। এই হলো কৃপণতার ফল। এই ধরনের কুঞ্জুসী ও কৃপণতার ঘোরতোর বিরোধী হলো ইসলাম।

ইসলাম শুধু খরচ করার শিক্ষাই দেয়নি বরং সাথে সাথে খরচ করার শালীনতাও শিক্ষা দিয়েছে। কোনো কোনো মানুষ অন্যের জন্য খরচ করে ঠিক কিন্তু তাদের এ খরচ হয় নিজস্ব কৌলীণ্য জাহির করার জন্য অথবা খ্যাতি অর্জন করার জন্য। এই ধরনের সমস্ত ভ্রান্ত পদক্ষেপকে ইসলাম নাজায়েজ সাব্যস্ত করে এবং এর মূলোৎপাটন করে। ইসলাম বলে খরচ করা ধর্মীয় অত্যাবশ্যকীয় বিধান এবং নামাযের পর এটা হলো দ্বিতীয় বড় রোকন। আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি ছাড়া খরচ করার অন্য উদ্দেশ্য যাতে তোমাদের না থাকে, এটাই আল-কুরআনের তাকিদ।

আমি কোনো এক শহরে দেখলাম যে, এক ব্যক্তি কোনো একটি সংস্থাকে টিউবলাইট উপহার দিয়েছিল এবং এর ওপর দাতার নাম এত বড় বড় অক্ষরে লিখে দিয়েছিল যে, এর মধ্যে দিয়ে আলো বের হতে পারছিল না। ইসলাম বলে, এ ধরনের দানের পদ্ধতি শুধু ভ্রান্তই নয় বরং নেকীসমূহকে বরবাদ করে দেয়। কোনো কোনো ব্যক্তি অন্যকে অর্থ অথবা বিভিন্ন ধরনের সাহায্য তো করে কিন্তু দান গ্রহীতার ওপর নিজ সাহায্যের চাপ ও খোঁটা এমনভাবে প্রয়োগ করে যে, তার অন্তরকে ছিন্ন করে দেয়। এই ধরনের পদক্ষেপ নিতে ইসলাম নিষেধ করে থাকে। আল-কুরআনে বলা হচ্ছে ঃ

"একটি মিষ্টি কথা এবং কোনো কটু কথা থেকে সামান্য বিরতি সে খয়রাত থেকে উত্তম যার পশ্চাতে রয়েছে কষ্টদায়ক কথা"।

বিনোবা ভাবে যখন ভূদান আন্দোলন চালাচ্ছিলেন তখন কিছু মানুষ উত্তম ভূমি দান করছিলেন। তার বহু লোক অনুর্বর পাথুরে জমি দান করেছিল। নিজ বাড়ীর ছেঁড়া, কাপড়, বাসী খাদ্য, ভাংগা বাসনপত্র দানকারী দাতা ও দুনিয়াতে পাওয়া যায়। ছেড়া নোট, অচল পয়সা দানকারীও দুনিয়ায় পাওয়া যাবে। কিন্তু ইসলাম সবচেয়ে উত্তম জিনিস খরচ করার শিক্ষা দিয়ে থাকে। নিজের পছন্দসই পোশাক, নিজ রুচি মত খাদ্য, মনোমত ধন সব আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করার জন্য তাকিদ প্রদান করে। আপনার আয়ের মধ্যে যেটা সবচেয়ে উত্তম সেটা আল্লাহ্‌র রাস্তার খরচ করা ইসলামের শিক্ষা। আল-কুরআনে বলা হচ্ছেঃ

"হে ঈমানদারেরা, যে সম্পদ তোমরা অর্জন করেছ এবং আমরা যা মাটি থেকে উৎপন্ন করেছি এর মধ্যে উত্তম অংশটি আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ কর। এমন যেন না হয় যে, আল্লাহ্‌র রাস্তায় দেয়ার জন্য খারাপ জিনিস বেছে বেছে রাখবে।" (আল বাক্বারা)

আপনি কাউকে খাদ্য, কাপড় অথবা আর্থিক সাহায্য যাই দেন, ইসলাম তা গোপনে দেয়াকে উত্তম বলে অভিহিত করে। যদিও প্রয়োজনের খাতিরে প্রকাশ্যেও দেয়া যায়। কুরআনে আছেঃ "যদি তুমি তোমার সদ্‌কা প্রকাশ্যে দাও তবে তা ভালো, কিন্তু গোপনে অভাবী জনের কাছে যদি দাও তাহলে আরো উত্তম।" (আল-বাক্বারা)

আল্লাহ্‌র পথে খরচ করা সম্পর্কে আর একটি অবস্থা এই হতে পারে যে, একজন অপব্যয়ী, মদ্যপ আপনার কাছে সাহায্যের জন্য এলো, আপনি কি তাকে সাহায্য করবেন? যদি সাহায্য করেন তবে এটা কোন্ ধরনের সাহায্য হবে? ইসলাম এ সমস্যারও সমাধান দিয়েছে। বিভ্রান্ত ও স্বল্প বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির হাতে পয়সা দেয়া যাবে না, এটাই হলো ইসলামের শিক্ষা। তবে তাদের খাওয়া পরার ব্যবস্থা করতে হবে। কুরআন বলেঃ "এবং তোমার সম্পদ যা আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম বানিয়েছে, নির্বোধ লোকের কাছে হস্তান্তর করোনা; অবশ্য তাদের খাওয়া পরা দেবে, সৎ রাস্তার

দিকে হিদায়াত করবে"।

তাদের মৌলিক প্রয়োজন খাওয়া-পরার ব্যবস্থা হওয়ার পর ইসলাম এ পর্যায়ে যে হিদায়াত দেয় এবার আসুন এগুলো সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করি।

(এক) তোমাদের এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততির জন্য খরচ করার পর যা অতিরিক্ত থাকবে তা থেকে আল্লাহ্র রাস্তায় খরচ কর।

(দুই) নিজ শক্তির বাইরে খরচ করবেনা, আবার কার্পণ্যও করবেনা—তুমি মধ্যপন্থা অবলম্বন করবে।

(তিন) খরচ না করে নিজ হস্তকে গুটিয়ে রেখোনা, আবার এমন খোলা হাতে খরচ করো না যে, শেষ পর্যন্ত তোমাকেই সাহায্যের প্রত্যাশী হতে হয়।

(চার) তোমাদের গরীব আত্মীয় স্বজন, অভাবী ফকির-ইয়াতিম এবং মুসাফির এসবই তোমাদের সাহায্যের প্রত্যাশী। নিজ সম্পদের জাকাত দেয়া মুসলমানের ওপর ফরজ। এই ফরজ আদায় থেকে বিমুখ ব্যক্তিরা অভিশপ্ত। একদা নবী (সাঃ) একজন নারীর হাতে একখানা সোনার বালা দেখতে পেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি এর জাকাত দিয়েছ? মেয়েটি বললো না। নবী (সাঃ) বললেন আখিরাতে তোমাকে আগুনের বালা পরানো হবে। (মেয়েটি সেই বালাখানি খয়রাত করে দিলেন)।

জাকাতের টাকা কোথায় খরচ করতে হবে কুরআন তারও ব্যাখ্যা দিয়েছেঃ গরীব, অভাবী, ঋণগ্রস্ত, ইয়াতিম ও মুসাফিরদের সাহায্য ছাড়াও জাকাতের টাকা মানুষের মন আকৃষ্ট করার জন্যও খরচ করা যেতে পারে। দাসমুক্ত করার জন্যও খরচ করা যেতে পারে। এছাড়া জাকাত আদায়ে নিযুক্ত কর্মচারীদের বেতন হিসেবেও এই তহবিল থেকে খরচ করা যেতে পারে। জাকাত ব্যয়ের খাতের মধ্যে " ফি সাবিলিল্লাহ" একটা খাত আছে। ফি সাবিলিল্লাহ-এর অর্থ ও তাৎপর্যের দিক থেকে একটা ব্যাপক অর্থবোধক পরিভাষা। কল্যাণমূলক সকল কাজ এই ফি সাবিলিল্লাহ্র আওতায় পড়ে। বিশেষ করে দীনের প্রচার ও প্রসার এবং এর প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম ইত্যাদিও

'ফি সাবিলিল্লাহ'র মধ্যে শামিল।

পিতা-মাতা এবং সন্তানাদি যার অভিভাবকত্ব নিজের কাছে থাকে, এদের জন্য জাকাতের টাকা খরচ করা যাবেনা। সম্পদের এই অংশতো অন্যের জন্য খরচ করার নিমিত্তে বের করতে আদেশ দেয়া হয়েছে।

এখন ইসলামী শিক্ষার অপর একটি দিক দেখুন। যতদূর সম্ভব সাহায্য চাওয়া ও ভিক্ষাবৃত্তি থেকে বিরত থাকার জন্য ইসলাম তাকিদ প্রদান করেছে। মানুষের এ চেষ্টাই করা উচিত যে, সে দাতা হবে, গ্রহীতা নয়। কারো নিকট হাত পাতার চেয়ে কাঠ কেটে দিন গুজরান করা উত্তম। নবী (সাঃ)—এর এই হলো শিক্ষা।

একদিন নবী (সাঃ) এক গেঁয়ো ব্যক্তিকে কাছে ডাকলেন এবং তার হাতে চুমু খেলেন, তার হাতে ছিল কঠিন শ্রমের চিহ্ন—সে তার দিন গুজরানের জন্য শ্রমিকের কাজ করতো এ কারণে নবী (সাঃ) খুশী হয়ে তার হস্ত চুম্বন করেছিলেন।

একদিকে ইসলাম ভিক্ষাবৃত্তিকে নিরুৎসাহিত করে, অপরদিকে সানন্দ চিত্তে মানুষের জন্য সম্পদ খরচ করতে উৎসাহিত করে। এ থেকে বোঝা যায় যে, ইসলামের শিক্ষা কত সুন্দর ও ভারসাম্য পূর্ণ।

কতিপয় ব্যাখ্যা

'ইসলাম ঃ জিস্‌সে মুঝে ইশ্‌ক হ্যায়' বইটি পড়ে অনেক সম্মানিত ব্যক্তি লেখককে ইসলাম সম্পর্কে কিছু আপত্তি ও প্রশ্ন করেছেন। আমি এখানে সে সব প্রশ্ন ও আপত্তি এবং তার জওয়াব পাঠকদের জ্ঞাতার্থে পেশ করছি।

মুসলিম দেশগুলোর পারস্পরিক ঝগড়া এবং ইসলাম

একজন অমুসলমান ভাই প্রশ্ন করেছেন যে, বর্তমানে আমরা দেখছি, মুসলমান দেশসমূহ পরস্পরে খড়্গ হস্ত অথচ তারা সবাই ইসলাম অনুসরণ করে। এতদসত্ত্বেও ইসলামের প্রতি আকর্ষণের কি থাকতে পারে?

আমি যতটুকু বুঝি ভালোবাসা তো ভালোবাসাই। মুসলমানদের দুর্বলতা ও

ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখে ইসলামের প্রসংশা থেকে আমরা বিরত থাকতে পারিনা। একথার প্রেক্ষিতে একব্যক্তি বললেনঃ

"আরব দেশসমূহের একে অপরের সংগে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া দেখে কি ইসলামের ওপর থেকে বিশ্বাস ও ভক্তি ওঠে যায় না"?

জবাব ঃ আপাত দৃষ্টে এ প্রশ্নটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন মনে হয়, কিন্তু বাস্তব অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। বিশ্বাস ওঠে যাওয়ার জন্য মজবুত ও শক্তিশালী ভিত্তি চাই। আমরা দেখি যে, চীন ও ভিয়েতনাম উভয়েই কমিউনিষ্ট লাল ঝাণ্ডার পতাকাবাহী, তথাপি এ দুয়ের মাঝে যুদ্ধ হলো। এখন কি হিন্দুস্তানের কমিউনিষ্টরা বলবে যে, কমিউনিজমের ওপর থেকে আমাদের বিশ্বাস উঠে গেল, অবশ্যই তারা একথা বলবেনা।

এমনিভাবে আমরা দেখি যে, হিটলার ও চার্চিল উভয়েই খৃষ্টান ছিলেন। দুজনের নেতৃত্বে জার্মান ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে ভয়াবহ লড়াই হয়েছিল। তাই বলে কি এই যুদ্ধ খৃষ্টানদের মন থেকে তাদের ঈমান ও আকিদা মুছে ফেলেছে এবং তারা খৃষ্টধর্ম থেকে তওবা করে ফেলেছে? কক্ষণই না। আবার দেখুন, হিন্দুস্তানে বিভিন্ন মন্দিরে বার বার ঝগড়া হয়েছে, এতে কি মন্দিরের পুজারীরা দেবতা-বিমুখ হয়ে দেবতা অস্বীকারকারী নাস্তিকে পরিণত হয়েছে? কক্ষণই নয়।

যদি এ ঘটনাবলী সত্য হয় তাহলে শুধু মুসলমান দেশের পারস্পরিক কলহের প্রেক্ষিতে ইসলামের প্রতি অসন্তোষের প্রশ্ন কেমন করে উঠতে পারে?

এটা তো দেশে দেশে ঝগড়া, যার সংগে ধর্মীয় বিশ্বাস ও আকিদার দূরতম সম্পর্কও নেই। এ ঝগড়া আজ আছে, কাল খতমও হয়ে যেতে পারে। কিন্তু বিশ্বাস ও আকিদা আজও আছে এবং কালও বাকী থাকবে। এই বিশ্বাস মুসলমানদের অপরিবর্তনীয় ও অটুট।

কমিউনিজম ও পুঁজিবাদ অবশেষে ইসলামের কাছে অবনমিত হবে ইতিহাসের পর্যালোচনা এ কথারই ইঙ্গিত বহন করে। অতীতের ইতিহাস, বর্তমানের ঘটনাবলী এবং ভবিষ্যতের আভাসও এদিকেই ইশারা করছে।

এই সমস্ত মুসলিম দেশ অত্যন্ত গরীব ছিল, কিন্তু আরবের মরুভূমি থেকে

দুনিয়া আলোকিত হবে—এই ছিল নবী (সাঃ)-এর ঘোষণা। আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি যে, অন্ধ সেখানে পাথরের মধ্যে পেট্রোল। আরবেরা ইসলামী আকিদার ওপর যতবেশী বিশ্বাস স্থাপন করবে ও কাজ করবে দুনিয়ায় আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ তাদের প্রতি অফুরন্ত হবে।

নবী (সাঃ)-এর জীবন ছিল নিষ্কলঙ্ক। আর এমনিতর ছিল খোলাফায়ে রাশেদীনেরও।

ইতিহাসের পরবর্তী যুগসমূহে কিছু কিছু নবাব ও বাদশাহর পদস্খলন হয়েছিল, কিছু কিছু বিভ্রান্তিও তাদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল; কিন্তু মুসলিম জাতির দীনের ওপর ও তার নীতিমালার ওপর অনড় বিশ্বাস থেকেই গেছে। প্রাথমিক যুগে এদের সংখ্যা ছিল লক্ষ্যে আর বর্তমানে তা পৌঁছে গেছে সোয়াশ' কোটিতে।

এ থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে, মুসলমান ও মুসলিম বাদশাহদের পদস্খলন ও দুর্বলতার জন্য আকিদা বিশ্বাসে নড়চড় হওয়ার প্রশ্ন সৃষ্টি হতে পারে না। ব্যক্তির ভুলে নীতি বাতিল হয় না, পরাভূত ও পর্যুদস্ত হয় না।

আসল কথা হলো ঃ দুনিয়ার জটিল সমস্যাবলীর সমাধান এবং দুনিয়ার বিপদোদ্ধার একমাত্র ইসলাম। সূর্য যদি ম্লান হয়ে যায় তবে আলো কোত্থেকে আসবে? সমুদ্র যদি লোনতা বন্ধ করে দেয় তবে লবণ কোত্থেকে আসবে। সাগর শুকিয়ে গেলে পানির ধারা কিভাবে আসবে? ইসলাম পরাজিত হলে সারা বিশ্ব ও মানব জাতি দুঃখকষ্টের হাত থেকে মুক্তি কোথায় পাবে?

ইসলামের সাজাসমূহ

সাধারণত অমুসলিম ভাইদের মাঝে এ কথা বহুল প্রচলিত এবং প্রচারিত যে, মুসলমানেরা অত্যন্ত নিষ্ঠুর এবং তাদের মধ্যে বর্বরোচিত সাজা চালু আছে। চোরের হাতকাটা ও ব্যাভিচারীকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা হয়। এটাও বলা হয় যে, মুসলমানেরা সামরিক অভিযান চালিয়ে মন্দির ধ্বংস করেছে এবং জুলুম নির্যাতনের ধারা চালু করছে। এসব বিভ্রান্তির ফলে বিরুদ্ধবাদীরা বলে যে, মুসলমানরা জালিম এবং নির্দয়।

এ অভিযোগ উত্থাপনের আগে মানুষের নিজের দিকে একটু তাকানো

দরকার তবেই প্রকৃত সত্য উদঘাটিত হতে পারে।

- ০ পুত্র হস্তিনী শাবককে জবেহ করলে মনুস্মৃতি আইনে পিতা পুত্রকে ফাঁসি দিয়ে দেয়। এ কাজকে তাহলে কি বলা যাবে?
- ০ বাদশাহর বাগানের একটি ফল নদীতে পড়ে ভাসতে ভাসতে এক জায়গায় আসলে একটি মেয়ে তা কুড়িয়ে খেয়ে নিয়েছিল সেই অপরাধে নুন্নান নামে এক বাদশাহ তাকে হত্যার শাস্তি দিল।
- ০ প্রসিদ্ধ কবি কংগীর পায়ের একখানা কংকন এক স্বর্ণকার চুরি করলে এই অপরাধে সমকালীন সকল স্বর্ণকারকে হত্যা করা হলো।
- ০ জ্ঞানসমুদ্র নামে এক পুরোহিত একটি মঠে বসবাস করতো। সেমিনার গোত্রীয় লোকেরা সেই মঠে আগুন লাগাবার চেষ্টা করলে এই অপরাধে তাদের আট হাজার লোককে শূলে চড়ানো হলো।
- ০ 'আপ্পর' নামে এক ব্যক্তি, ধর্মান্তরিত হলে এই অপরাধে তাকে পাথরের সাথে বেঁধে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়। সেখান থেকে সে বেঁচে ফিরে আসলে তাকে তখন উত্তপ্ত চুনের ভাটিতে ফেলে দেয়া হলো।
- ০ ভানালীরামন ঘটনাবলীর মধ্যে একটি ঘটনা এও পাওয়া যায় যে, শাহী হুকুম না মানার অপরাধে মানুষকে জীবন্ত কবর দেয়া হতো, আবার কোনো কোনো ব্যক্তিকে হাতীর পায়ের নীচে পিষ্ট করা হতো।
- ০ তামিলনাড়ুর তিরমুলাই এবং মহীশুরের এক রাজার মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল, যুদ্ধে মানুষের নাক কেটে দেয়া হয়েছিল। মহীশুরের রাজা তামিলনাড়ুর ওপর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য সামরিক অভিযান চালিয়েছিল এবং মানুষের কান ও ঠোঁট কেটে দেয়া হয়েছিল। অতঃপর এর প্রতিশোধে তামিলনাড়ুর রাজা মহীশুর আক্রমণ করলো এবং দুশমনদের নাক ঠোঁট কেটে দিল। (নায়েক বাদশাহদের ইতিহাস গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে)।
- ০ শিশুদের বলিদান, মানুষের অংগ প্রত্যংগের মানত করার প্রচলন আজও ভারতের অনেক জায়গায় পাওয়া যায়, দয়া ও দয়াদ্রতার নাম কি এটাই?

- পশ্চিমী দুনিয়ায় শূলে চড়ানো একটা সাধারণ ব্যাপার। হযরত মসীহকে শূলে চড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। সেন্ট পিটারকে উল্টিয়ে লটকিয়ে শূলে দেয়া হয়েছিল।
- 'জান অফ আরক' কে জীবন্ত পুড়ে মারা হয়েছিল।
- প্রোটেস্টাইন্ট ধর্ম গ্রহণকারীদের মাথা ফেঁড়ে মগজ টুকরা টুকরা করা হয়েছিল এবং তাদেরকে জীবন্ত জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছিল।
- জন্তু-জানুয়ারের মতো আফ্রিকা থেকে মানুষ নিয়ে আসা হতো এবং ইউরোপের বাজারে দাস হিসাবে নিলামে বিক্রি করা হতো। — এই হলো পশ্চিমী সভ্যতাঃ
- হিটলার গ্যাস চেম্বারে অসংখ্য মানুষ হত্যা করেছিল।

এখনও হিন্দুস্তানের বিভিন্ন স্থান থেকে খবর আসে যে, উচ্ছৃংখল জনতাকে জীবন্ত জ্বালিয়ে দেয়া হয়। আলীপুর, জামশেদপুর, তেলসার ঘটনাবলীর এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

এমনিভাবে দুনিয়ার প্রতিটি দেশের ইতিহাস জুলুম-নির্যাতনের কলঙ্কময় কাহিনী দিয়ে ভরে আছে। বিভিন্ন দার্শনিকের মতবাদের ওপর জুলুম-নির্যাতন চালু রাখা হয়েছে। এটাই হলো তাদের দয়া ও অনুকম্পার বহিঃপ্রকাশ।

পাশবিক ও নির্যাতনমূলক ধ্যান–ধারণাকে মিটিয়ে সে স্থলে সঠিক অর্থে দয়া ও অনুকম্পার শিক্ষাদানকারী কোনো সত্য ধর্ম যদি থাকে তবে তা হলো ইসলাম।

কোনো কোনো ধর্মে আল্লাহ্ তায়ালার গুণাবলীকে বিভক্ত করে প্রতিটি গুণের জন্য একটা আলাদা রব মানা হয়। কোনো কোনো ধর্মে আবার আল্লাহ্কে গুণাবলী বিমুক্ত সত্তা মনে করা হয়। অথচ ইসলামে আল্লাহ্ সরাসরি রহমত হিসেবে পরিদৃষ্ট হয়। রসুল (সাঃ)-এর আগমণকে রহমত হিসেবে বিভূষিত করা হয়েছে। আল-কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় রহমান ও রহিম হিসেবে আল্লাহ তায়ালার পরিচয় দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালার নিকট তা অত্যন্ত পছন্দসই। তার গুণ রহমতের প্রতিকৃতি তার বান্দাদের মধ্যেও প্রতিফলিত হোক।

ইসলামের শিক্ষা হলো যে, প্রতিটি কাজ দয়ালু ও দয়াবান আল্লাহ্র নামে শুরু করবে। ইসলাম সালাম প্রথার যে প্রচলন করেছে সেখানেও প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসা প্রকাশ পায়। প্রকৃত মুসলিম অন্যের প্রতি দয়ালু, মেহেরবান এবং দয়ার্দ হয়ে থাকে। এটাই আল-কুরআনের শিক্ষা। নবী (সাঃ)-এর চরিত্র ও আদর্শ হলো এটাই।

কিছু কিছু ব্যক্তি যদি এই দয়ার্দতার পথ থেকে বিচ্যুত হয় তবে ইসলাম তাদেরকে এ পথে পাল্টিয়ে আনার দিকে তাকিদ প্রদান করে।

তুরস্কের এক বাদশাহ্ সুলতান সেলিম। তিনি তাঁর অধিনস্তদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। তাঁর দেশের সকল ভাষা ও সকল ধর্মকে মিটিয়ে দিয়ে এক ভাষা ও এক ধর্ম চালু করার ইচ্ছা করেছিলেন। কিন্তু সেই সময় শায়খুল ইসলামের তীব্র বিরোধিতার মুখে সুলতানকে শেষ পর্যন্ত তার ইচ্ছা পরিবর্তন করতে হয়।

চিত্তবিনোদনের জন্য আজও বিভিন্ন দেশে জন্তু-জানোয়ার ও পাখীদের মধ্যে পরস্পরে লড়াই বাঁধিয়ে দেয়ার ঘটনা দেখা যায়, ইসলাম এ ব্যপারে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করেছে।

আদী বিন হাতিম পিপড়াদের খোরাক পৌঁছাতেন—এ ছিল ইসলামী শিক্ষার প্রভাব। রাস্তায় চলাচলের অধিকার পশুদেরও আছে—তাঁদেরকে তাড়িয়ে দেয়া নিষেধ। সিরাজী এই ঘোষণাই দিয়েছিল। এই ধরনের ঘটনাবলী মুসলমানদের ইতিহাসেই পাওয়া যায়।

উটের ওপর যদি তিন ব্যক্তি চড়তেন এবং উট এ কারণে বোঝার চোটে যদি দাবিয়ে যায় তাহলে জোরপূর্বক একজনকে নামিয়ে দাও, এই হিদায়াতও ইসলামে পাওয়া যায়।

এটা সত্য যে, দয়া ও অনুকম্পার শিক্ষা ইসলামই দেয়। আবার কঠিন অপরাধের অপরাধীকে শক্ত সাজা দেয়ার শিক্ষাও ইসলামই দেয়। চোরের হাত কাটার শাস্তি ইসলাম দিয়েছে এ কথা ঠিক, কিন্তু এর পরিণাম ও প্রভাব দেখুন, যে সমস্ত দেশে এই আইন চালু আছে সে সমস্ত দেশে চুরির ঘটনা অতি বিরল।

আরব দেশে খুনীর মস্তক তলোয়ার দিয়ে উড়িয়ে দেয়া হয়, যেখানে অন্যান্য দেশে ফাঁসি দেয়া হয় অথবা বৈদ্যুতিক চেয়ারে বসিয়ে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। শূলে অথবা বৈদ্যুতিক চেয়ারে কঠিন আজাবের ভেতরে জান বের হয় এজন্য তলোয়ার দিয়ে মৃত্যুদণ্ডকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

মুসলমানেরা কি মন্দির ভেঙ্গেছে?

এরূপ আর একটি ভিত্তিহীন অভিযোগ হলো যে, মুসলমানেরা হিন্দুস্তানে মন্দির ভেঙ্গেছে। এরকম অপবাদ দেয়ার সময় আমরা ভুলে যাই যে, এই ধরেন ঘটনাবলী স্বয়ং ভারতে অন্যান্য লোকেরাও ঘটায়। আমাদের এখানে সেমিনার সম্প্রদায়ের মন্দিরগুলোকে ভাঙ্গা হয়েছে। আমরা এটাও ভুলে গেছি যে, নাগাতিনম–এর মুর্তিগুলো লুট করা হয়েছে এবং সেখানে যা সোনা ছিল তরু মঙ্গী এলাকার লোকেরা তা উঠিয়ে নিয়ে গেছে।

আমরা তো বলি যে, মুসলমানেরা মন্দির ভেঙ্গেছে অথচ আমরা ভুলে যাই যে, তারা হিন্দু মন্দিরদের জন্য জমিও ওয়াক্ফ করেছে।

মুসলমানেরা যদি কিছু মন্দির ভেঙ্গেও থাকে তবে সে গুলোর কারণ অন্য কিছু। ইসলামের শিক্ষা এটা নয় যে, অন্যের ইবাদতখানাগুলোকে ধ্বংস করে দেবে।

এই প্রসংগে এক ব্যক্তি প্রশ্ন তুলেছেন, হিন্দুস্তানের ইতিহাস থেকে জানা যায়, মুসলমানেরা মন্দির ও মূর্তি ভেঙ্গেছে। এ ব্যাপারে আপনি কি বলেন? প্রকৃত পক্ষে হিন্দুস্তানের যে ইতিহাস আমাদের হাতে এসেছে, তা কোনো সত্যনিষ্ঠ ও সততার নিরিখে পর্যালোচনা করা হয়নি। মুসলমানদের এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মাঝে শত্রুতা সৃষ্টির জন্য পশ্চিমী ফেতনাবাজরা এই ইতিহাস লিখেছেন। যদি এটা প্রমাণিত হয় যে, মুসলমানেরা মন্দির ধ্বংস করেছে এবং মূর্তি ভেঙ্গেছে তাহলে আমার জওয়াব এই হবে যে, ইসলামে অন্য ধর্মের মন্দির ভাংগার অথবা মূর্তি ধ্বংস করার কোনো অনুমতি নেই। এ কাজের ভাগীদার সে মাহমুদ গজনবীই হোক অথবা তার সেনাপতিই হোক, তাদের সংগে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। বরং ইসলামী রাষ্ট্র তো অমুসলমানদের ইবাদতখানাগুলোর হিফাজতকারী।

মূর্তিগুলোর পূজা ভ্রান্ত। মানুষের মধ্যে এই ধারণা ইসলাম সৃষ্টি করে। এবং এ ব্যাপারে ইসলাম সুস্পষ্ট প্রমাণাদি পেশ করে। ধর্মের ব্যাপারে কোনো জোর-জবরদস্তির নেই। ইসলাম এই ঘোষণা স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করে। সে চায় মানুষের অন্তরের জগৎ শিরক ও কুফর থেকে পাক ও পবিত্র হোক। তাদের মধ্যে সত্যের আলো ছড়িয়ে পড়ুক। এ জন্য সে দাওয়াত ও তবলিগের ব্যবস্থা করেছে; জোর জবরদস্তি পথ এর সম্পূর্ণ মেজাজের খেলাফ। নবী (সাঃ) ক্বাবাকে মূর্তি থেকে পবিত্র করেছেন। এটা ঐতিহাসিক সত্য, কিন্তু এখানে এটা ভুলে গেলে চলবেনা যে, ক্বাবার মর্যাদা আল্লাহ্র ঘরের মর্যাদা। এতে মূর্তিঘর তো লোকেরা নিজেদের অজ্ঞতা ও মুর্খতার কারণে বানিয়েছে। ক্বাবা শুধুমাত্র আল্লাহ্র এবাদতের জন্যই নির্মাণ করা হয়েছিল। এ কথা আরবের মূর্তিপুজকেরাই স্বীকার করে। পরবর্তীকালে আল্লাহ্র ঘরে অনেক মূর্তি স্থাপন করা হয়। যা একেবারেই ভ্রান্ত। এই সমস্ত মূর্তিকেই নবী (সাঃ) ক্বা'বা থেকে সরিয়ে ফেলেছিলেন। এবং তাকে পূর্বের ন্যায় নিরঙ্কুশ আল্লাহ্র ইবাদত গৃহে পরিণত করেন। নবী (সাঃ) খৃষ্টান ও ইহুদীদের ধর্মশালাগুলো মাটির সংগে মিশিয়ে দিয়েছিলেন এরূপ নযির পেশ করা সম্ভব নয়।

ইসলামের প্রচার ও তরবারি

এটাও প্রশ্ন করা হয় যে, ইসলাম তলোয়ারের জোরে বিস্তার লাভ করেছে। তার নিজস্ব সৌন্দর্য ও সুষমায় দুনিয়ায় বিস্তার লাভ করেনি।

এটা শুধু একটা দাবি মাত্র। এর কোনো প্রমাণ নেই। আল-কুরআন তো জোর-জবরদস্তি করে কোনো কাজ করা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিয়েছে।

ইসলামে সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপনকারীরা দুনিয়ার ইতিহাস বেমালুম ভুলে থাকে। তাদের মুখ খুলে কেবল ইসলামের বিরুদ্ধে। যুক্তি বিহীন অপবাদ তালাশ করার কাজে লিপ্ত হয়ে যায় তারা। বিশ্বের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে বোঝা যাবে যে, অনেক দেশ নিজস্ব পন্থা ও ধর্মকে শক্তির জোরে বিস্তার লাভ করিয়েছে। দূরে কেন যাব, বৌদ্ধধর্ম অশোক ও হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বকালে হিন্দুস্তানে রাষ্ট্রীয় শক্তির দ্বারা বিস্তার লাভ করেছে। সেমিনর ধর্মেরও ইতিহাসে এ রকম একটা যুগ গেছে, যে—সময় হিন্দুস্তানের রাজা মহারাজারা সেমিনর ধর্মাবলম্বী ছিল এবং হিন্দুস্তানে এই ধর্মই ছেয়ে গেছিল।

এর পর বৈদিক ধর্ম (হিন্দুধর্ম)-এর যুগ আসলো। এই ধর্ম রাষ্ট্রের সাহায্যে শক্তির জোরে অন্যান্য ধর্মের লোকদের নিশ্চিহ্ন করে দিল এবং এ পর্যায়ে মানুষকে শূলে পর্যন্ত চড়ানো হয়েছিল। এমনি ধরনের পন্থা গ্রহণ করে সারা হিন্দুস্তানকে একটি হিন্দুরাষ্ট্রে পরিণত করার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল। এরপরও হিন্দুস্তানী রাজা- রাজন্যরা সামরিক অভিযান চালিয়ে অন্যান্য দেশেও নিজ ধর্ম বিস্তার করেছিল। জাভা, সুমাত্রা, কম্বোডিয়ায় আজও হিন্দুধর্মের ও মূর্তিপূজকের প্রভাব দেখা যায়। খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী রাজা-বাদশাহ্‌রা যখন অন্যান্য দেশে সামরিক অভিযান চালালো, তখন সেখানে তারাও খৃষ্ট - ধর্ম আরো অধিক বিস্তারের জন্য চেষ্টা করেছিল।

এখন যদি এ কথা প্রমাণ হয় যে, কিছু কিছু মুসলমান শাসক ইসলাম প্রচারে নিজস্ব প্রভাব প্রতিপত্তির ব্যবহার করে থাকে, তবে তা কোনো এমন দোষণীয় নয় যে, এর ভিত্তিতে ইসলামের বদনাম করার চেষ্টা করতে হবে।

আজ শিক্ষিতসমাজে বার বার এ অপবাদ দেয়া হচ্ছে যে, ইসলাম নিজস্ব শক্তির জোরে নয় বরং তলোয়ারের জোরে বিস্তার লাভ করেছে। কিন্তু কি আশ্চর্য! এই অভিযোগ উত্থাপনের মধ্যে এমন শক্তিধর ব্যক্তিও নযরে পড়ছে, যারা বন্দুকের নল দেখিয়ে নিজেদের নীতি ও আদর্শকে বিস্তার লাভ করানোর জন্য নির্লজ্জ প্রচেষ্টা চালিয়েছে। অথচ তাদের দৃষ্টি একবারও নিজেদের দিকে পড়ছেনা।

আজকের যুগে ধর্মের ব্যাপারে জোর জবরদস্তির কোনো প্রশ্নই ওঠে না। অবশ্য নিজস্ব চিন্তা-গবেষণার ওপর ঠিক থেকে অন্যের কাছে এটা পৌঁছানোর অধিকার প্রত্যেকের আছে। আজকেও ইসলাম গ্রহণকারীদের সংখ্যা মোটেও কম নয়। তবে এটা কোন্ তোলোয়ারে জোরে? সেটা কোনো লোহার তলোয়ার নয়। ইসলামের সততা, ন্যায়নিষ্ঠতা, মাহাত্ম ও শ্রেষ্ঠত্বের মহান আদর্শই দুনিয়ার সচেতন মানুষকে এর প্রতি প্রবল বেগে আকৃষ্ট করেছে।